আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারি
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

সুজন বড়ুয়া

আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারি
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

সুজন বড়ুয়া

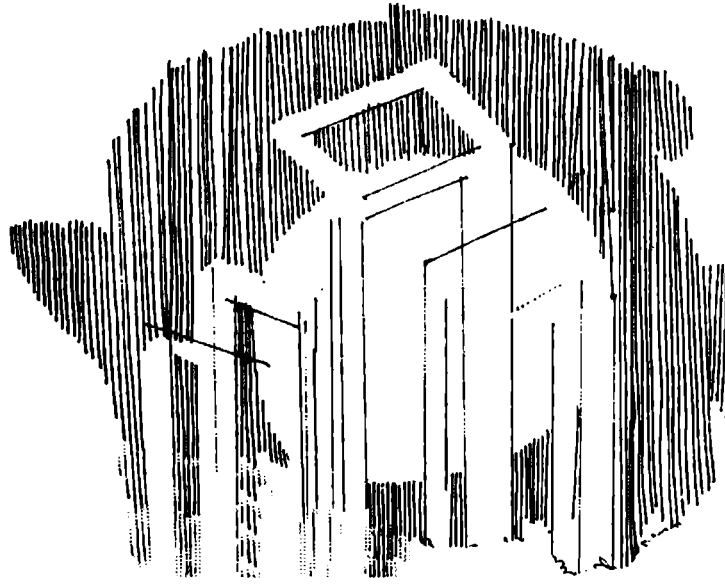

ঝিঙেফুল ◆ ঢাকা

www.phulkuri.org.bd

আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
সুজন বড়ুয়া

প্রকাশক
গিয়াসউদ্দীন খসরু
ঝিঙেফুল
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন :৭১৬৪৯৮৪, ০১৫২৪৫৮১৫০, ০১৭১২৯৭৬৪০৯

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

দ্বিতীয় সংস্করণ
জুন ২০১০

শব্দবিন্যাস
ঝিঙেফুল কম্পিউটার এন্ড গ্রাফিক্স
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন :৭১৬৪৯৮৪

প্রচ্ছদ
মোশতাক রায়হান

মূল্য
১০০.০০ টাকা মাত্র

AMADER AKUSHE FEBRUARY
(A book on International Mother Tongue Day for juvenile)
Sujan Barua

Published by JINGHEPHUL
34 North Brook Hall Road
Banglabazar, Dhaka-1100.
Ph : 7164984, 0152458150, 01712976409
Price : Tk. 100.00 Only. US $ 3.00

ISBN 984-642-073-0

উৎসর্গ

আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক
সৈয়দ শাহ জামাল
করকমলে
যাঁর সরস ও সযত্ন পাঠদানে
কৈশোরে আমার সাহিত্য অনুরাগের ভিত গড়ে উঠেছে

www.phulkuri.org.bd

সূ চি প ত্র

আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারি	৭
আ-মরি বাংলা ভাষা	৮
বাংলাকে পাওয়ার জন্য	১৪
হাসিমুখে যারা দিয়ে গেল প্রাণ	২৯
স্মৃতির মিনার শহীদ মিনার	৩৩
শিল্পী-কবির হৃদয়-বীণায় একুশে	৩৯
একুশের স্বপ্ন বাংলা একাডেমী ও একুশে গ্রন্থমেলা	৪৭
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস	৫২
ভালোবাসি মাতৃভাষা	৫৮

www.phulkuri.org.bd

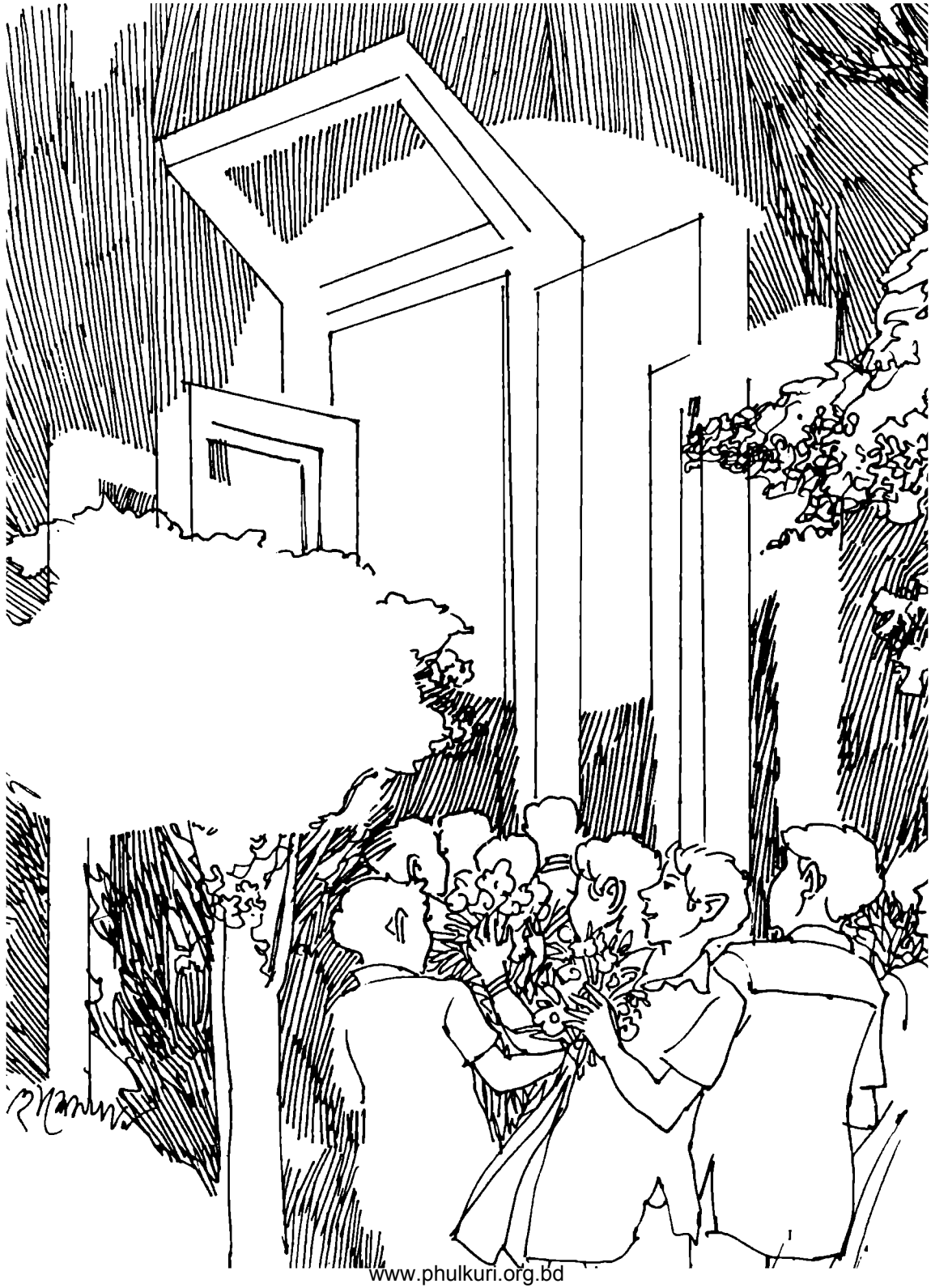

www.phulkuri.org.bd

আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারি

আমাদের জাতীয় ইতিহাসে অনেক স্মরণীয় দিন আছে। এর প্রতিটি দিনই বিশেষ বিশেষ মহিমায় উজ্জ্বল। যেমন কোনোটি গৌরবে থরোথরো, কোনোটি আনন্দে ঝলোমলো, কোনোটি আবার বিষাদে মর্মর। তাই আমাদের কাছে সব স্মরণীয় দিনের গুরুত্ব এক রকম নয়; একেকটি দিনের গুরুত্ব একেক রকম। তবু আমাদের স্মরণীয় দিনগুলোর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ দিন নিশ্চয়ই আছে, যে দিনটি আমাদের জাতীয় ইতিহাসে বাতিঘরের মতো উজ্জ্বল, যে দিনটির আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে আমাদের অন্যান্য দিন। হ্যাঁ, আমাদের সেই শ্রেষ্ঠ দিন নিশ্চয়ই একুশে ফেব্রুয়ারি।

কেন এ দিনটি শ্রেষ্ঠ ?

এ দিনে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা প্রথম মাথা তুলে দাঁড়িয়েছি। এ দিনে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে বুকের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করে আমরা পৃথিবীতে প্রথম ইতিহাস সৃষ্টি করেছি। এ দিনেই আমরা ভালোবাসা দিয়ে বন্দুককে পরাজিত করতে সমর্থ হয়েছি। এ দিনেই আমরা প্রথম পরাধীনতার বদ্ধ দুয়ারে কড়াঘাত করার প্রয়াস পেয়েছি। এ দিনটিই আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা-অধ্যায়।

এই মহান দিনটি ছিল ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি। আমরা আবেগ ভরে এ দিনটিকে বলি 'অমর একুশে' বা 'শহীদ দিবস'। ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত এ দিনটি ছিল আমাদের শহীদ দিবস, ছিল একান্তই আমাদের। কিন্তু এখন এ দিনটি বিশ্বের সকল মানুষের।

১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের জন্য বয়ে এনেছে এক অনন্য গৌরব। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (ইউনেস্কো) একুশে ফেব্রুয়ারিকে দিয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি। একুশে ফেব্রুয়ারিকে ঘোষণা করা হয়েছে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'। ২০০০ সাল থেকেই বিশ্বে একুশে ফেব্রুয়ারি পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষ দিবস হিসেবে।

আমাদের ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতি বিজড়িত 'অমর একুশে' আজ পেয়েছে বিশ্ব-সম্মান। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের গৌরবোজ্জল ঐতিহাসিক সেই অধ্যায় এখন মাতৃভাষার সম্মান ও মর্যাদা দানে বিশ্ববাসীকে অনুপ্রাণিত করে। আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারি এখন বিশ্বসভ্যতার সম্পদ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যদি হয় আমাদের হাজার বছরের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ অর্জন, তা হলে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ অর্জন হল দিনপঞ্জির একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি। কেননা যুগে যুগে একুশে ফেব্রুয়ারি যেমন আমাদের শক্তি সাহস ও প্রেরণা যুগিয়েছে, তেমনি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছে আমাদের গৌরবময় পরিচিতি। তাই একুশে আমাদের গর্ব, একুশে আমাদের অহঙ্কার; একুশে আমাদের এক শ্রেষ্ঠ দিন।

আ-মরি বাংলা ভাষা

পৃথিবীর সব মানুষেরই একটি আপন ভাষা আছে—যাকে বলে মাতৃভাষা। যে ভাষা তার মায়ের, তার বাবার আর তার সমাজের। যে ভাষায় কথা বলে সে নিজে। যে ভাষায় সে প্রকাশ করে আনন্দ, বেদনা, স্বপ্ন, কল্পনা, আশা, ভালোবাসা। যে ভাষার জন্য তার প্রাণ আনচান করে। কারণ মাতৃভাষা ছাড়া কেউ প্রাণ খুলে কথা বলতে পারে না। মাতৃভাষা ছাড়া মনের আবেগ যেন বেগ পায় না। কবি বলেন—

নানান দেশের নানান ভাষা
বিনা স্বদেশী ভাষা
পুরে কি আশা ?
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর
ধারা জল বিনে কভু
মুছে কি তৃষা?
(রামনিধি গুপ্ত)

পৃথিবীতে কত মা আছে, তবু একজনের জন্যই মানুষের চোখ জলে ভরে ওঠে। ভাষাও ঠিক মায়ের মতো পরম আদরের একটি ধন। মা-সন্তানের সম্পর্কের মতোই ভাষার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নাড়ির। শিশুর প্রথম বোলই ফোটে 'মা' বলে। আর তাই নিজের ভাষাকে বলা হয় মাতৃভাষা। মায়ের পরিচয় যেমন সন্তানের পরিচয়, তেমনি ভাষার পরিচয়ই মানুষের মূল পরিচয়। তার জাতীয় পরিচয়ও মেলে ভাষায়। যেমন ইংরেজি ভাষী জাতির নাম ইংরেজ, আরবি ভাষী জাতির নাম আরব, তেমনি আমরা বাঙালি, কারণ আমাদের মাতৃভাষা বাংলা।

হ্যাঁ, আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। এ ভাষায় ময়ূরের মতো নেচে ওঠে আমাদের আনন্দ, এ ভাষায় সূর্যের মতো রক্তিম আভা ছড়ায় আমাদের সুখ, এ ভাষায় শিশিরের মতো টুপটাপ ঝরে পড়ে আমাদের দুঃখ বেদনা দীর্ঘশ্বাস। আমাদের সুখ দুঃখ আনন্দে আর কোনো ভাষা এমন পুলকিত শিহরিত ও মর্মরিত হয় না। এ ভাষা ছাড়া আমাদের স্বপ্ন ভেঙে যায়। এ ভাষার জল ছাড়া আমাদের তৃষ্ণা মেটে না। এ ভাষায় কথা বলতে না পারলে আমাদের বুক ভারি হয়ে ওঠে। এ ভাষাই আমাদের জীবন। আমরা বাংলা ভাষার রূপ-লাবণ্য ও ধ্বনিমাধুর্যে মুগ্ধ।

আমাদের প্রিয় এই বাংলা ভাষা আমরা কোথা থেকে পেলাম? এমন রূপময় মধুর ভাষা নিশ্চয়ই হঠাৎ গজিয়ে ওঠে নি। এ ভাষা নিশ্চয়ই দু'দশ বছর বা এক শ' দু' শ' বছরে সৃষ্টি হয় নি। নিশ্চয়ই এর একটি প্রাচীন ঐতিহ্য আছে। আমরা এখানে তা একটু জেনে নিতে পারি।

ভাষা মানুষেরই সৃষ্টি। কিন্তু ভাষার ধর্ম হল বদলে যাওয়া। ভাষার গতি নদীর চেয়েও বেগবান আর পরিবর্তনশীল। অল্প দূরত্ব ও স্বল্প সময়েই ভাষার ঘটে যায় অভাবনীয় রূপান্তর। আমাদের ভাষার বেলায়ও এমনটি ঘটেছে। আমরা এখন যে বাংলা ভাষা বলি, শুরুর দিকে তা ঠিক এরকম ছিল না। বাংলা ভাষা একটি পুরাতন ভাষার ক্রমবদলেরই ফল।

www.phulkuri.org.bd

গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ করলে দেখা যায় কোনো কোনো ভাষার ধ্বনিব্যঞ্জনা ও শব্দগঠন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অন্য ভাষার বেশ মিল রয়েছে। পণ্ডিতদের বিশ্বাস একই আদি ভাষা থেকে সৃষ্টি হওয়ার কারণে এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার এই মিল পাওয়া যায়। পণ্ডিতেরা বলেছেন, পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাষাগুলোর বংশ এক। পৃথিবীর যাবতীয় ভাষাকে পণ্ডিতেরা কয়েকটি ভাষাবংশে ভাগ করেছেন। ইউরোপ ও ভারতে প্রচলিত ভাষাগুলোর ভাষাবংশের নাম ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ বা ভারতী–ইউরোপীয় ভাষাবংশ। এ ভাষাবংশের ভাষাগুলোকে আর্য ভাষাও বলা হত। পণ্ডিতদের মতে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ শতাব্দীরও আগে আর্য নামে এক জাতির কিছু কিছু লোক ইরান দেশের ভেতর দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। এরাই ভারতীয় আর্য নামে পরিচিত। এদের প্রাচীনতম ভাষার নাম বৈদিক ভাষা বা বেদের ভাষা। আর্যদের একটি শাখা ইউরোপেও বসতি স্থাপন করে। ইউরোপের বর্তমান ভাষাগুলো আর্যদের ভাষা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

যা হোক, আসল কথায় ফিরে আসি। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশে আছে আবার অনেকগুলো ভাষাশাখা। একটি শাখার নাম ভারতীয় আর্য ভাষা। ভারতীয় আর্য ভাষার প্রাচীন ভাষাগুলোকে বলা হয় প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা।

ভারতীয় আর্য ভাষা বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কালক্রমে আঞ্চলিক ভাষার রূপ লাভ করে। পরিবর্তনের এই কালপর্বকে পণ্ডিতেরা তিনটি যুগে ভাগ করেছেন। যুগ বিভাগগুলো হল— বৈদিক যুগ, প্রাকৃতের যুগ ও অপভ্রংশের যুগ বা বর্তমান আঞ্চলিক ভাষার যুগ।

খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দ পর্যন্ত বৈদিক যুগ। এই যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক নির্দশন 'ঋগ্বেদ'—যা একটি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ হিসেবে সুপরিচিত। এ সময় আর্যরা আরো নানা বেদ রচনা করেন। বেদের সেসব শ্লোক অনুসারীরা মুখস্থ করে রাখত।

খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রাকৃতের যুগ। এ সময় ক্রমে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ভাষা বদলে যেতে থাকে। এক সময় সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে বেদের ভাষা বা বৈদিক ভাষা। তখন ব্যাকরণবিদেরা নানা নিয়ম বিধিবদ্ধ করে একটি মান ভাষা সৃষ্টি করেন। ওই ভাষার নাম সংস্কৃত। কিন্তু সংস্কৃত কথ্য ভাষা ছিল না; ছিল লেখা ও পড়ার ভাষা। এর পাশাপাশি ভারতবর্ষে যে কথ্য ভাষাগুলো ছিল, সেগুলোকে বলা হত প্রাকৃত। মোটামুটিভাবে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রাকৃত ভাষাগুলো কথ্য ও লিখিত ভাষারূপে ভারতের পাঞ্জাব, মগধ তথা বিহারসহ বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত ছিল।

প্রাকৃত ভাষাগুলোর শেষ স্তরের নাম অপভ্রংশ অর্থাৎ বিকৃত বা অপভাষা। অপভ্রংশের যুগে প্রাকৃতের আরো পরিবর্তন সাধিত হয়। এই অপভ্রংশরাশি থেকেই উৎপন্ন হয়েছে বিভিন্ন আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষা। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মগধ অঞ্চলে প্রচলিত একটি অপভ্রংশের নাম দিয়েছেন মাগধী অপভ্রংশ। তিনি মনে করেন ৯০০ বা ৯৫০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে অর্থাৎ দশম শতকে মাগধী অপভ্রংশ থেকেই আমাদের এই মধুর কোমল বিদ্রোহী বাংলা ভাষার জন্ম। একই উৎস থেকে জন্ম নিয়েছে আরো দুটি ভাষা– আসামি ও ওড়িয়া। সেদিক থেকে এ দুটি ভাষা বাংলা ভাষারই সহোদর।

আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারি
www.phulkuri.org.bd

আমাদের ভাষাবিদ-পণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা ভাষার জন্ম সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি মনে করেন ৬৫০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি কোনো সময়ে অর্থাৎ সপ্তম সতকে– গৌড়ী প্রাকৃত থেকে জন্ম নিয়েছিল আধুনিকতম প্রাকৃত বাংলা ভাষা। তবে আজকাল এত প্রাচীন মনে করা হয় না বাংলাকে। এত আগের না হলেও ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের হিসেবে বাংলা ভাষার বয়স এখন এক হাজার এক শত বছর। পৃথিবীর জীবিত ভাষাগুলোর মধ্যে অত্যন্ত বয়স্ক ভাষা বাংলা।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মীর মশাররফ হোসেন

ইসমাইল হোসেন সিরাজী

কাজী নজরুল ইসলাম

জসীম উদ্‌দীন

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

জন্মের পর বাংলা ভাষা এক স্থানে স্থির হয়ে বসে থাকে নি। মানুষের কণ্ঠে ও লেখক কবিদের রচনায় সে নিয়েছে নুতন নতুন বাঁক। বাঁকে বাঁকে সে ফুটিয়েছে হাজারো রঙের সুগন্ধি ফুল। জ্যোৎস্না-অন্ধকার ভেঙে এগিয়েছে সামনের দিকে। এ বাঁক বদলের প্রকৃতি অনুসারে বাংলা ভাষাকে আবার ভাগ করা হয়েছে তিন ভাগে। আদি বা প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ ও বর্তমান যুগ।

আনুমানিক ৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আদি যুগ। এ যুগের ভাষা ছিল প্রাকৃতের প্রভাবযুক্ত। অর্থাৎ ভাষা তখনো পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করতে পারে নি। প্রাচীন যুগের

সাহিত্যের একমাত্র নিদর্শন 'চর্যাপদ' নামে বৌদ্ধগান ও দোহাগুলি। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থশালা থেকে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে আবিষ্কার করেন এ বই। বাংলা ভাষার প্রথম বইও এটি।

চর্যাপদে মোট ৪৭টি পদ রয়েছে। এগুলোর রচয়িতা ২৩ জন। এঁরা ছিলেন বৌদ্ধ বাউল-কবি। এঁদের বলা হত সিদ্ধাচার্য। বাংলা ভাষায় লেখা হলেও চর্যাপদের ভাষায় কিছু রহস্য ও হেঁয়ালি লক্ষ করা যায়। এগুলোর আসল অর্থ উদ্ধার করা কখনো কখনো বেশ কঠিন। ভাষার এই আলো-আঁধারি বৈশিষ্ট্যের জন্য চর্যাপদের ভাষাকে 'সন্ধ্যা' ভাষা বলা হয়। পদগুলোতে সেই সময়ের বাঙালির জীবন ও সমাজের ছবি উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে।

আদি যুগের পরের বাংলা ভাষাকে বলা হয় মধ্য যুগের বাংলা ভাষা। ১২০১ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ছ'শ' বছরের এ যুগ। এর প্রথম দেড় শ' বছর অর্থাৎ ১২০১ থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা ভাষার কোনো নমুনা পাওয়া যায় নি। তবু মধ্য যুগেই ঘটে বাংলা ভাষার পূর্ণ বিকাশ, এ সময়ই সংস্কৃতের প্রভাবে রূপ বদল হয় বাংলা ভাষার এবং গোড়াপত্তন হয় বাঙালির জাতীয় সাহিত্যের। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও পদাবলী, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, মালাধর বসুর ভাগবতের অনুবাদ, শ্রীকর নন্দীর মহাভারত ইত্যাদি এ যুগেরই রচনা। মধ্য যুগের বাংলা ভাষা সুদূর অচেনা নয়—এর অনেক কিছুই বোঝা যায়। এর অনেক শব্দ আজকের শব্দের মতো, ধ্বনিও আজকের ধ্বনির মতো অনেকটা।

১৮০১ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাংলা ভাষার আধুনিক যুগ শুরু। এ যুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে পুরনো ধারার পরিবর্তে নতুন ধারার সৃষ্টি হয়। নতুনকে স্বাগত জানিয়ে বাংলা গদ্যের জন্ম হয়, পদ্য নতুন পথে বাঁক নেয়; নাটকে-উপন্যাসে-প্রবন্ধে নতুনের জয়বার্তা যেন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসগার, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যয়, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মীর মশাররফ হোসেন, কাজী নজরুল ইসলাম, জসীম উদ্‌দীন প্রমুখ কবি-সাহিত্যিক আধুনিক যুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তুলেছেন।

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন শতকে বিভিন্নভাবে বদলে সুন্দর, সজীব ও শক্তিশালী হয়ে গড়ে উঠেছে বাংলা ভাষা। একটি জীবন্ত ভাষার লক্ষণ হল অন্যান্য বিদেশী ভাষা থেকে নতুন নতুন শব্দ আহরণের মধ্য দিয়ে সে নিজেকে সমৃদ্ধ করে। বাংলা ভাষাও ইংরেজি, ফরাসি, পর্তুগিজ, উর্দু, হিন্দি, ফার্সি আরবি ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষা থেকে অনেক শব্দ গ্রহণ করেছে। ভাষাবিদদের মতে, অন্তত আড়াই হাজার ফার্সি শব্দ বাংলা ভাষায় স্বচ্ছন্দে স্থান করে নিয়েছে। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যেই শতাধিক পর্তুগিজ এবং ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে প্রচুর ইংরেজি শব্দ বাংলা শব্দ ভাণ্ডারের আপন সম্পদ হয়ে উঠেছে। তবে বাংলা ভাষার মূল উপাদান হল—মূল দেশী শব্দ এবং সংস্কৃত থেকে উদ্ভুত তৎসম, অর্ধ তৎসম ও তার থেকে উত্থিত তদ্ভব শব্দ। আসলে বাংলা সংস্কৃত ভাষার ঐতিহ্যে লালিত একটি ভাষা।

www.phulkuri.org.bd

ভাষার কথা বলতে গেলে অবশ্যই লিপির প্রসঙ্গ আসে। কেননা লিপি ছাড়া ভাষাকে স্থায়ী রূপ দেওয়া যায় না। তাই এই সূত্রে আমাদের বাংলা লিপির কথাও সংক্ষেপে জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

আজকের এই বাংলা লিপি খুব বেশি পুরনো নয়। নানা পরিবর্তন বিবর্তনের মধ্য দিয়েই এই লিপির প্রচলন হয়েছে। প্রাচীন ভারতে ব্যবহৃত বর্ণমালা ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী হল বাংলা বর্ণমালার আদি উৎস। বাংলা বর্ণমালার ঠিক পূর্বরূপের নাম কুটিল লিপি। ধারণা করা হয় যে, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে মগধ তথা বিহারের একেবারে পার্শ্ববর্তী বাংলা অঞ্চলেও ব্রাহ্মী লিপি চালু ছিল। দীর্ঘ দেড় হাজার বছরের রূপ বদলের প্রক্রিয়ায় পঞ্চদশ শতকে পূর্ণাঙ্গ বাংলা লিপির উদ্ভব হয়। 'আকার' 'ই-কার'-এর মতো কিছু বিশেষ চিহ্ন বাদ দিলে ১১টি স্বরবর্ণ ও ৩৯টি ব্যঞ্জণবর্ণসহ মোট ৫০টি বর্ণ নিয়ে গড়ে উঠেছে বাংলা বর্ণমালা।

বাংলা ভাষার হাজার বছরের ইতিহাস আমাদের জন্য এক গর্বের বস্তু। বাংলা তার দুই সহোদর আসামি ও ওড়িয়া ভাষাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেছে অনেক দূর। পৃথিবীতে প্রচলিত প্রায় পাঁচ হাজার ভাষার মধ্যে বাংলার অবস্থান একেবারে উপরের দিকে। পৃথিবীর পঞ্চম সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা বাংলা। প্রায় ৩০ কোটি লোক মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা ব্যবহার করে। এই ভাষা 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' রাষ্ট্রের জাতীয় ভাষা। বাংলাদেশের সংবিধান এই ভাষায় রচিত। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা রাজ্যের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। এ ছাড়া আসাম, মণিপুর, বিহার, ওড়িষ্যা ও আরাকানে বসবাসকারী বাংলা ভাষী মানুষের মাতৃভাষা বাংলা। ভারতবর্ষের ষোলটি 'জাতীয় ভাষা'র অন্যতম ভাষা হল বাংলা। বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকাসহ পৃথিবীর প্রধান প্রধান বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলা ভাষায় বেতার কার্যক্রম প্রচারিত হয়। বাংলা ভাষায় সাহিত্য সাধনা করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার মধ্য দিয়ে এই ভাষা পেয়েছে আন্তর্জাতিক খ্যাতি। এই ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির রক্তক্ষয়ী আন্দোলন পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র ভাষা আন্দোলন। এই ভাষার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে আমাদের প্রিয় দেশ বাংলাদেশ : পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশ সে অনন্য দেশ, যার জন্মের মূলে কাজ করেছে ভাষা; ভাষার নামেই যার নাম। বাংলা—দেশ। ভাষা বাংলা, দেশও বাংলা। এমন উদাহরণ পৃথিবীতে সম্ভবত আর একটিও নেই। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর জাতিসংঘের শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (ইউনেস্কো) বাংলা ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিবাহী দিন একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ঘোষণা করেছে। ইউনেস্কোর এই ঘোষণার মাধ্যমে বাংলা ভাষা পেয়েছে নতুন মাত্রা ও সম্মান।

বাংলা ভাষা পেরিয়ে এসেছে হাজার বছরেরও বেশি সময়। হাজার বছরে পৃথিবীর কত ভাষা থেমে গেছে, হারিয়ে গেছে, মরে গেছে। এক সময়ের ভাষার রাজা গ্রিক, লাতিন, সংস্কৃত, পালি আজ মৃত ভাষা। কিন্তু বাংলা জীবন্ত ও প্রাণবন্ত। যখন তখন মুখর হয়ে ওঠে বাঙালির আকুল মুখ থেকে, বুক থেকে, রক্ত ও অস্তিত্ব থেকে। হাজার বছর ধরে উদ্দাম স্রোতস্বিনীর মতো বাংলা

বয়ে চলেছে অবিরল দুর্বার। তার গন্তব্য মহাসমুদ্র, তার ঠিকানা মহাকাল। তার এই দুর্বার যাত্রায় আমরা উদ্ভাসিত। আমরা তার গর্বে গর্বিত। তার জয়গান গাইতে আমাদের ভালো লাগে। আমরা তার স্তবগান করি।

বাংলা স্বদেশী গান

মোদের গরব, মোদের আশা, আ-মরি বাংলা ভাষা!
তোমার কোলে, তোমার বোলে, কতই শান্তি ভালোবাসা!
কি জাদু বাংলা গানে! গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে,
(এমন কোথা আর আছে গো।)
গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা॥
ঐ ভাষাতেই নিতাই গোরা, আনল দেশে ভক্তি-ধারা,
(মরি হায়, হায় রে!)
আছে কই এমন ভাষা এমন দুঃখ-শ্রান্তি-নাশা॥
বিদ্যাপতি, চণ্ডী, গোবিন, হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন!
(আরো কত মধুপ গো!)
ঐ ফুলেরই মধুর রসে বাঁধল সুখে মধুর বাসা॥
বাজিয়ে রবি তোমার বীণে, আনল মালা জগৎ জিনে,
(গরব কোথায় রাখি গো!)
তোমার চরণ-তীর্থে আজি জগৎ করে যাওয়া-- আসা—
ঐ ভাষাতেই প্রথম বোলে, ডাকনু মায়ে 'মা', 'মা' বলে;
ঐ ভাষাতেই বলব হরি, সাঙ্গ হলে কাঁদা হাসা॥

(অতুল প্রসাদ সেন)

বাংলাকে পাওয়ার জন্য

বাংলা আমার সাধ, বাংলা আমার সাধনা, বাংলা আমার স্বপ্ন, বাংলা আমার শয়ন, বাংলা আমার জাগরণ, বাংলা আমার ভাষা। বাংলা এখন একান্তই আমার—আমাদের। কিন্তু এ বাংলাকে শুরুতেই আমরা আমাদের মতো করে পাই নি। বাংলাকে আপন করে পেতে আমাদের সময় লেগেছে অনেক দিন, অপেক্ষা করতে হয়েছে অনেক বছর। এ জন্য আমাদের করতে হয়েছে আন্দোলন- সংগ্রাম। দিতে হয়েছে অনেক রক্ত। সে এক করুণ ইতিহাস। সে ইতিহাস আমাদের জানা দরকার। আর ইতিহাস জানতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে পেছনের দিকে।

আমরা জানি আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি এই বাংলাদেশ এক সময় পরাধীন ছিল। দীর্ঘকাল এই ভূ-খণ্ড শাসন করেছে বিদেশী শাসকেরা। কখনো দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্মণ, কখনো তুর্কি, কখনো পাঠান, কখনো মোগল, কখনো ইংরেজ, কখনো পাঞ্জাবিরা শাসন করেছে এ দেশ। বিদেশী শাসনের সঙ্গে সঙ্গে শত শত বছর ধরে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা পেয়েছে নানা বিদেশী ভাষা। যেমন ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় দু'শ বছর এ দেশসহ পুরো ভারতবর্ষ ছিল ইংরেজ শাসনের অধীনে। তখন এ দেশের সরকারি ভাষা ছিল ইংরেজি। এর আগে সরকারি ভাষা ছিল ফার্সি।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর আম্রকাননের যুদ্ধে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হলে ব্রিটিশ রাজশক্তি ভারতীয় উপমহাদেশে রাজত্ব কায়েম করে। ভারতবর্ষে ছিল হিন্দু, মুসলমান, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ইত্যাদি ধর্মাবলম্বী লোকের বসবাস। এদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানই ছিলেন প্রধান। সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক থেকে মুসলমানেরা ছিলেন দ্বিতীয় জনগোষ্ঠী। এ ছাড়া বাংলাদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানে তারা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মীয় সম্প্রদায়। একই শাসকের অধীনে থাকলেও হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানা বিরোধ বৈষম্য দেখা দেয়। এই বৈষম্য নিরসনের উপায় হিসেবে ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের ভিত্তিতে দুটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দাবি ওঠে এবং ১৯৪৭ সালে ভারতবাসীর এই দাবি পূরণ হয়।

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটে। তখন ভারতীয় উপমহাদেশে জন্ম নেয় দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র। একটি পাকিস্তান ও অন্যটি ভারত। বাংলাদেশ নামের এই অঞ্চলটি অন্তর্ভুক্ত হয় পাকিস্তানে। তখন বাংলাদেশকে বল হত পূর্ব বাংলা, পূর্ব বঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তান। এটি ছিল পাকিস্তানের একটি প্রদেশ। পাকিস্তানের পশ্চিম অঞ্চলকে বলা হত পশ্চিম পাকিস্তান। পাকিস্তানের ওই অংশে ছিল ৪টি প্রদেশ। প্রদেশগুলো হল—পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান। পুরো পাকিস্তানের শাসনভার ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে। যে রাজনৈতিক দল তখন দেশ শাসনের ক্ষমতা লাভ করে তার নাম ছিল মুসলিম লীগ।

পাকিস্তানের ৫টি প্রদেশের ভাষা ছিল আলাদা। পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা, পাঞ্জাবের পাঞ্জাবি, সিন্ধুর সিন্ধি, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পশতু এবং বেলুচিস্তানের ভাষা বালুচি। কিন্তু ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় ভারত থেকে দেশত্যাগ করে পাকিস্তানের উভয় অংশে প্রচুর উর্দু ও অন্যান্য ভাষাভাষী লোক আসে। এই সব মোহাজের নাগরিকের সংখ্যা ছিল পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার প্রায় আড়াই ভাগ। পাকিস্তানের প্রথম রাজধানী ও প্রধান বন্দর করাচি শহরে যেসব মোহাজের বসতি গড়ে তোলে তারা ছিল মূল উর্দু ভাষী। সুতরাং পাকিস্তানের রাজধানীর ভাষা হয়ে পড়ে উর্দু। কিন্তু পাকিস্তানের শতকরা প্রায় ৫৫% ভাগ লোক বসবাস করত পূর্ব পাকিস্তানে এবং তাদের ভাষা ছিল বাংলা। পশ্চিম পাকিস্তানের বাকি শতকরা ৪৫% ভাগ লোকের ভাষা ছিল পাঞ্জাবি, সিন্ধি, পশতু, বালুচি ও উর্দু। ১৯৪৮ সালের শুরুতে পাকিস্তানের মোট ৬ কোটি নব্বই লক্ষ মানুষের মধ্যে চার কোটি চল্লিশ লক্ষ ছিল বাংলা ভাষাভাষী। অর্থাৎ পাকিস্তানের অন্যান্য ভাষাভাষীর মোট সংখ্যার চেয়ে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা ছিল অধিক। স্বাভাবিকভাবেই এ অঞ্চলের মানুষের প্রত্যাশা ছিল স্বাধীন রাষ্ট্রে দেশীয় ভাষা বাংলা রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পাবে।

কিন্তু প্রথম থেকেই বাংলা ভাষার প্রতি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরূপ মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সদ্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানে প্রথম এনভেলাপ, পোস্টকার্ড, ডাকটিকিট, মনিঅর্ডার ফর্ম ইত্যাদি ছাপা হয় ইংরেজি ও উর্দু ভাষায়; বাংলাকে এতে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উপেক্ষা করা হয়। এর প্রতিবাদে সঙ্গে সঙ্গে ঢাকায় ছাত্র, শিক্ষক ও সরকারি কর্মচারীদের একাংশের বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। তবে এই বিক্ষোভ ছিল অসংগঠিত ও বিচ্ছিন্ন।

১৯৪৭ সালের শেষ দিকে এ দেশের মানুষ সচেতন, সংহত ও সংগঠিত হতে শুরু করে। ১৯৪৭ সালের ২৭শে নভেম্বর করাচিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দু ভাষার পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ঢাকায় ছাত্র-শিক্ষক সমাজ সংগঠিতভাবে ৫ই ডিসেম্বর থেকে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। ৬ই ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার প্রধান উদ্যোক্তা ছিল 'তমদ্দুন মজিলিস' নামে একটি ছাত্র-শিক্ষক সংগঠন। সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, জগন্নাথ কলেজ এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররাও যোগ দেন। রাষ্ট্রভাষার দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এটাই ছিল সর্বপ্রথম সাধারণ ছাত্রসভা। এতে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ও তমদ্দুন মজলিসের সম্পাদক আবুল কাসেম এবং বক্তৃতা করেন মুনীর চৌধুরী, আবদুর রহমান, কল্যাণ দাসগুপ্ত প্রমুখ।

এ ধরনের কয়েকটি সভা-সমাবেশের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে গঠিত হয় 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি'।

১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। অধিবেশনের তৃতীয় দিনে অর্থাৎ ২৫শে ফেব্রুয়ারি কুমিল্লা থেকে নির্বাচিত পূর্ব বাংলার সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাকেও গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে যুক্ত করার প্রস্তাব করেন। তাঁর যুক্তি এতে গণপরিষদের সদস্যরা ইচ্ছামতো ইংরেজি, উর্দু বা বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে পারবেন। কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন

www.phulkuri.org.bd

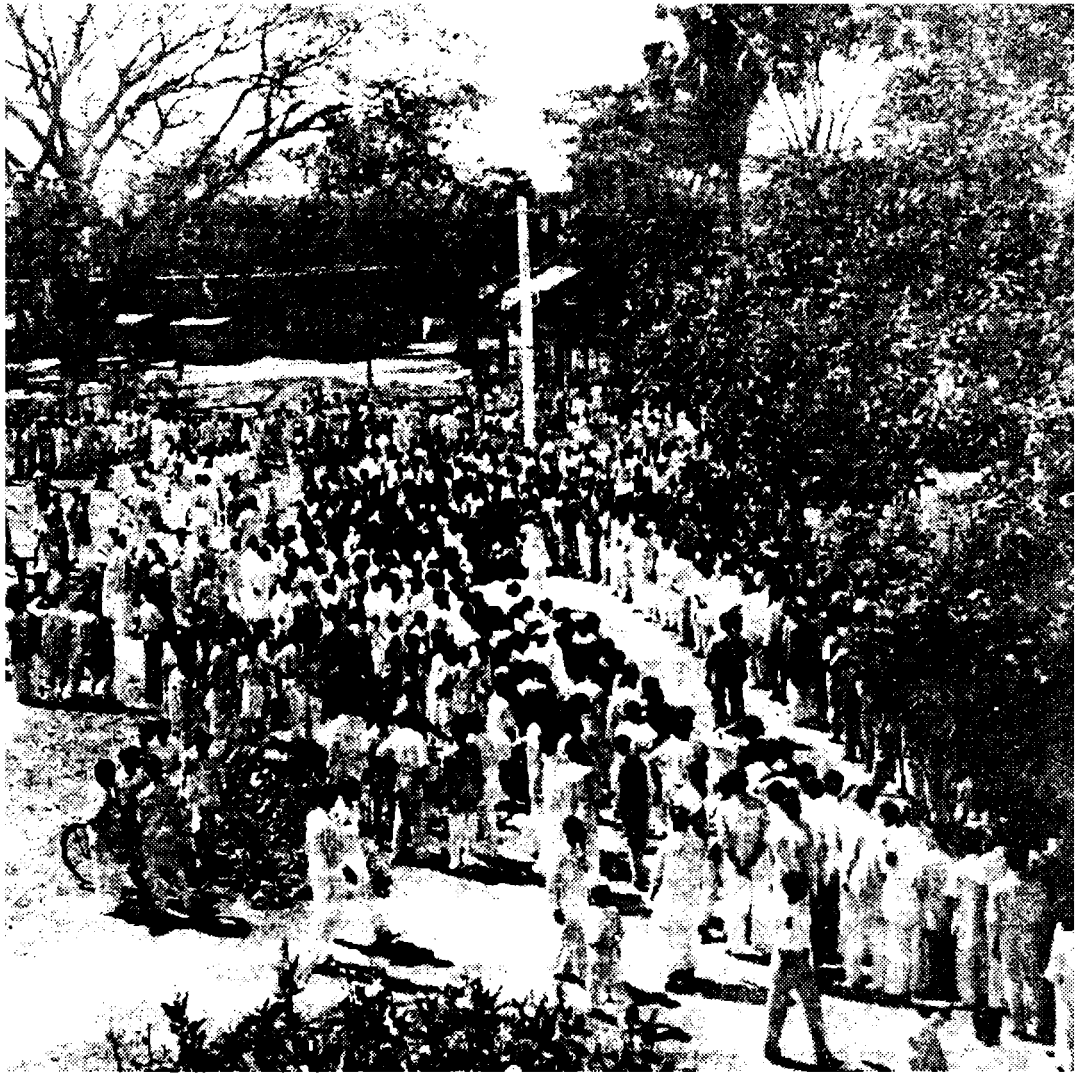

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন কলাভবন প্রাঙ্গণে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের প্রস্তুতি

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান, পাকিস্তান গণপরিষদের সহ-সভাপতি ফরিদপুরের মৌলবী তমিজউদ্দিন খান এবং পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ঢাকার নবাব পরিবারের সন্তান খাজা নাজিমুদ্দিন। এর ফলে পাকিস্তান গণপরিষদে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা বাংলা স্বীকৃতি লাভে ব্যর্থ হয়। উল্টো বাংলা ভাষী মানুষের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয় অন্য ভাষা।

গণপরিষদে বাংলা ভাষা বিরোধী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ২৬শে ফেব্রুয়ারি ঢাকার ছাত্র-সমাজ ধর্মঘট পালন করেন। ওই দিন ঢাকা বিশ্বদ্যিালয় মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস বর্জন করে মিছিল বের করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্রসভা করেন।

www.phulkuri.org.bd

এর পর ২রা মার্চ ফজলুল হক হলে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভার উদ্দেশ্য ছিল গণপরিষদের সিদ্ধান্ত ও পাকিস্তান মুসলিম লীগের বাংলা ভাষা বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলা। সভাটি যৌথভাবে আয়োজন করে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, বিভিন্ন ছাত্রাবাস ও তমদ্দুন মজলিস। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরুদ্দীন আহমদ। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন রণেশ দাশগুপ্ত, আজিজ আহমদ, অজিত গুহ, আবুল কাসেম, সরদার ফজলুল করিম, শামসুদ্দীন আহমদ, কাজী গোলাম মাহবুব, নঈমুদ্দীন আহমদ, তফজ্জল আলী, শামসুল আলম, মুহম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, শামসুল হক, শহীদুল্লা কায়সার, লিলি খান, তাজউদ্দিন আহমদ প্রমুখ। এই সভায় 'রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ' নামে একটি সর্বদলীয় পরিষদ গঠিত হয়। পরিষদের আহবায়ক মনোনীত হন শামসুল আলম। এই সভা থেকে ১১ই মার্চ সমগ্র পূর্ব বাংলায় সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। এবং এ দিনটিকে 'রাষ্ট্র ভাষা দিবস' হিসেবে পালনের আহবান জানানো হয়।

১১ই মার্চ সারা দেশে ধর্মঘট পালনের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্ররা বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা করেন। ইডেন বিল্ডিংয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় গেট, রমনা পোস্ট অফিস, পলাশী ও নীলক্ষেত ব্যারাক, জেলা আদালত, হাইকোর্ট, রেলওয়ে ওয়ার্কশপ ইত্যাদি স্থানে বিশেষ বিশেষ সমাবেশের ব্যবস্থা করা হয়। নানা জায়গায় পুলিশ ছাত্রদের বাধা দেয়, অনেক জায়গায় ছাত্রদের উপর পুলিশ ব্যাপক লাঠিচার্জ করে, ঘন ঘন ফাঁকা গুলি ছোঁড়ে এবং কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। ফলে অনেক ছাত্র আহত ও বহু ছাত্র গ্রেফতার হন। এ দিন পুলিশ ঢাকায় শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদ, শওকত আলী, কাজী গোলাম মাহবুবু প্রমুখকে গ্রেফতার করে। এই দমননীতির ফলে ছাত্ররা আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠেন, স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ব্যাপক আকারে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ১৩ই মার্চ ঢাকায় ও ১৪ই মার্চ সারা দেশে ছাত্র ধর্মঘট পালন করা হয়। এবং ১৫ই মার্চ সারা দেশে সাধারণ ধর্মঘট আহবান করা হয়।

এই পরিস্থিতিতে সরকার পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়, পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ঢাকা সফর করবেন।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্র ঢাকা সফরকে সামনে রেখে ১৫ই মার্চ মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন তাঁর বাসভবন 'বর্ধমান হাউস'-এ বসে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে ৮ দফার এক মীমাংসা-চুক্তি সম্পাদন করেন। চুক্তির প্রধান প্রধান শর্ত ছিল ভাষা আন্দোলনে গ্রেফতারকৃত বন্দিদের নিঃশর্ত মুক্তিদান, পূর্ববঙ্গ আইনসভার আসন্ন অধিবেশনে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব উত্থাপন, পুলিশী নির্যাতন সম্পর্কে তদন্ত, সংবাদপত্রের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, আন্দোলনকারীগণ রাষ্ট্রের দুশমন নন—এই মর্মে স্বীকারোক্তি প্রদান ইত্যাদি। চুক্তির বোঝাপড়ার ভিত্তিতে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্র আসন্ন ঢাকা সফরের জন্য রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ আন্দোলন কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নেয়।

১৯৪৮ সালের মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ঢাকা সফরে আসেন। ২১শে মার্চ ঢাকায় রমনার মাঠে তিনি এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করেন। ওই বক্তৃতার এক পর্যায়ে তিনি বলেন, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অন্য

আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারি
www.phulkuri.org.bd

কোনো ভাষা নয়।' একই সঙ্গে তিনি এ কথাও জানিয়ে দেন, 'এ ব্যাপারে কেউ বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করলে বুঝতে হবে সে পাকিস্তানের প্রকৃত শত্রু।' অর্থাৎ তিনি বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি নাকচ করে দেন এবং বাংলা ভাষার পক্ষে আন্দোলনকারীদের পাকিস্তানের শত্রু আখ্যা দেন।

২৪শে মার্চ তারিখে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে আবার জোর দিয়ে বলেন, 'কেবলমাত্র একটি রাষ্ট্রভাষাই থাকতে পারে ..... সেই ভাষা আমার মতে কেবল উর্দুই হতে পারে।'

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্র এই ঘোষণায় সমাবর্তনে উপস্থিত ছাত্ররা 'না,' 'না' বলে প্রতিবাদ করে ওঠেন।

ওই দিনই রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের একটি প্রতিনিধি দল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর কাছে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি সংবলিত একটি স্মারকলিপি পেশ করেন।

এর কিছু দিন পর ১৯৪৮ সালের ৮ই এপ্রিল পূর্ব বাংলা আইনসভার অধিবেশনে বাংলাকে কেবলমাত্র পূর্ব বাংলার সরকারি ভাষা রূপে ঘোষণা করা হয়। অথচ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের চুক্তি ছিল বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সুপারিশ করার। তিনি সেই চুক্তি ভঙ্গ করেন।

সরকার এভাবে কেবল উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার চক্রান্তে লিপ্ত ছিল তা নয়। তাদের গোপন পরিকল্পনা ছিল বাংলাকে ধ্বংস করার। এই উদ্দেশ্যে নানা কৌশলও প্রয়োগ করতে থাকে তারা। যেমন আরবি হরফে বাংলা বই ছাপিয়ে বিনামূল্যে ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ এবং সর্বজনীন উর্দু-শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন ইত্যাদি।

এভাবে নবপ্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাংলা বার বার শাসকগোষ্ঠীর চক্রান্তের শিকার হয়। পূর্ব বাংলার জনগণ এসব চক্রান্তের বিরুদ্ধে ক্রমেই সোচ্চার ও সংগঠিত হতে থাকে এবং এভাবেই সূত্রপাত হয় ভাষা আন্দোলনের।

১৯৪৮ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত বাংলা ভাষার দাবি কেবল সভা-শোভাযাত্রা-প্রতিবাদ-বিক্ষোভ ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই চার বছর ছাত্ররা ১১ই মার্চ দিনটিকে 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' হিসেবে পালন করেছেন। কিন্তু আন্দোলন তেমন জোরালো রূপ লাভ করে নি।

১৯৫১ সালের ১৬ই অক্টোবর পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান রাওয়ালপিণ্ডিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনকে তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করা হয়। পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হন নুরুল আমীন। তখন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ও পূর্ব বাংলার উভয় সরকার ছিল মুসলিম লীগ দলের।

১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে খাজা নাজিমুদ্দিন নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের ঢাকা অধিবেশনে যোগ দিতে পূর্ব বাংলায় আসেন। ২৭শে জানুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে এক বিশাল জনসভায় তিনি বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন,

'পূর্ব বাংলা প্রদেশের ভাষা কী হবে সেটা পূর্ব বাংলার জনগণই স্থির করবেন। কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা একটিই হতে হবে এবং তা হবে উর্দু।'—

খাজা নাজিমুদ্দিনের এই বক্তৃতার পর পরই বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ৩০শে জানুয়ারি ধর্মঘট আহবান করে। আহবান অনুযায়ী ছাত্ররা ওই দিন ধর্মঘট পালন করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় প্রতিবাদ সভা আয়োজন করেন। এই সভা থেকে ১৯৪৮ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তি রক্ষা করার জন্য খাজা নাজিমুদ্দিনের প্রতি দাবি জানানো হয়। সভায় বক্তারা ভাষা আন্দোলনকে দৃঢ়ভাবে সংগঠিত করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এ ছাড়া ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্তও এ সভায় ঘোষণা করা হয়। সভা শেষে ছাত্ররা প্রায় এক মাইল দীর্ঘ একটি মিছিল বের করে শহরের প্রধান সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করেন। মিছিলে ছাত্ররা 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই', 'আরবি হরফ চলবে না', 'নাজিমুদ্দিন গদি ছাড়ো' ইত্যাদি স্লোগান দেন। ৩০শে জানুয়ারির ধর্মঘট ও সভা থেকেই ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের নতুন পর্বের সূচনা হয়।

৩১শে জানুয়ারি রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ঢাকা বার লাইব্রেরি হলে একটি সর্বদলীয় কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। এ দিন ৪০ সদস্য বিশিষ্ট একটি 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' গঠন করা হয়। এর আহবায়ক নির্বাচিত হন কাজী গোলাম মাহবুব এবং উল্লেখযোগ্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন মওলানা ভাসানী, আবুল হাশিম, আতাউর রহমান খান, কমরুদ্দীন আহমদ, শামসুল হক, মুহম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, আবদুল মতিন ও খালেক নওয়াজ খান।

৩০শে জানুয়ারির ঘোষণা অনুযায়ী ৪ঠা ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকা শহরের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘটের পর ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হন এবং সেখানে একটি সভা করেন। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন গাজীউল হক। সভায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সারা পূর্ব বাংলায় ২১শে ফেব্রুয়ারি সাধারণ ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সাধারণ ধর্মঘটের তারিখ ২১শে ফেব্রুয়ারি নির্ধারণের পেছনে একটি কারণ ছিল, কারণ আগেই সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, ২০শে ফেব্রুয়ারি পূর্ব বাংলা পরিষদের পরবর্তী অধিবেশন শুরু হবে। এ জন্য ২১শে ফেব্রুয়ারি সভা, শোভাযাত্রা ও হরতালের মধ্য দিয়ে ব্যাপকভাবে বাংলা ভাষার দাবি তুলে ধরার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

১৩ই ফেব্রুয়ারি পালিত হয় 'পতাকা দিবস'। এ সময় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীরা ২১শে ফেব্রুয়ারি পালনের জন্য 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' দাবির ব্যাজ বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করেন।

ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকার ২১শে ফেব্রুয়ারি কর্মসূচির ব্যাপকতায় প্রচণ্ড বিচলিত হয়ে পড়ে। ২০শে ফেব্রুয়ারি বিকেল থেকেই ঢাকা শহরে এক মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে সভা, সমাবেশ, মিছিল ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয়। মাইকযোগে ও রেডিওর মাধ্যমে সরকার এই ঘোষণা প্রচার করে। এর ফলে শহরে দ্রুত উত্তেজনা ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

www.phulkuri.org.bd

পরিস্থিতি বিবেচনা করার জন্য সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ জরুরি বৈঠকে বসে। এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আওয়ামী মুসলিম লীগ অফিস, ৯৪ নবাবপুর রোডে। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন আবুল হাশিম। বৈঠকের প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা না করার প্রশ্নটি। অধিকাংশ সদস্যই ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিরোধিতা করেন। তাদের মূল যক্তি ছিল ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলে দেশে চরম বিশৃঙ্খলা ও সঙ্কটজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। অন্যদিকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে মত প্রকাশ করেন অলি আহাদ ও আবদুল মতিন। তাঁদের যুক্তি ছিল ১৪৪ ধারা জারি করে সরকার যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে, তাতে সরকারি নিষেধাজ্ঞার কাছে নতি স্বীকার করলে ভাষা আন্দোলনের কোনো অগ্রগতি তো হবেই না, বরং তা আরো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এমনকি আন্দোলন একেবারে স্তিমিত হয়ে যেতে পারে।

এদিকে একই সময়ে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম কমিটিও এক বৈঠকে বসে। সেখানে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এই সিদ্ধান্ত সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের বৈঠক চলাকালে তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়। অবশেষে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা বা না করার বিষয় ২১শে ফেব্রুয়ারি সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে সভা করে স্থির করা হবে।

ছাত্র-সমাজ বরাবরই ২১শে ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার দাবিতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে সভা, শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের পক্ষে। ২০শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরের বিশ্ববিদ্যালয় হোস্টেলসমূহে ছাত্ররা পরের দিনের আন্দোলনের গোপন প্রস্তুতি নিতে থাকেন তোড়েজোরে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে সারারাত ধরে চলতে থাকে বাংলা ভাষার দাবি ও ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে অসংখ্য পোস্টার ফেস্টুন লেখা। ঢাকার কোনো ছাত্রের চোখে যেন ঘুম নেই। ছাত্রনেতারা একে অন্যের সঙ্গে রক্ষা করে যাচ্ছিলেন সার্বক্ষণিক যোগাযোগ। কর্মীরা কাজ করছিলেন গভীর মনোযোগ ও সতর্কতার সঙ্গে।

২০শে ফেব্রুয়ারি রাতের যথার্থ বর্ণনা পাওয়া যায় ভাষা সৈনিক-সাহিত্যিক-গবেষক আহমদ রফিকের ভাষায়। "বিশে ফেব্রুয়ারি রাতটা ছিল ওৎ পেতে থাকা চিতার মতো সতর্ক ও টানটান।..... শিক্ষায়তন এলাকার পথ-ঘাট আপাতদৃষ্টিতে শান্ত মনে হলেও ছাত্রাবাসগুলোতে টগবগ করছে তারুণ্যের বলিষ্ঠ তেজ। বাতাসে যেন এক সম্ভাবনার ঘ্রাণ ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।"

বাংলা ঋতুর হিসেবে ২১শে ফেব্রুয়ারি বসন্তের প্রথম ভাগের একটি দিন। তবু শীতের আমেজে ভরপুর। রাত কিছুটা দীর্ঘ। দীর্ঘ রাত পেরিয়ে অবশেষে আসে একুশের ভোর—১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের ৮ই ফাল্গুন এবং ১৩৭১ হিজরির ২৪শে জমাদিউল আউয়াল। কেমন ছিল সেদিনের সকাল। হয়তো বিষণ্ন, কিন্তু বিক্ষুব্ধ-বিহ্বল।

'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' ২১শে ফেব্রুয়ারি সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করায় সকাল থেকেই ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় দোকানপাট ছিল বন্ধ। কিছু সরকারি গাড়ি ছাড়া যানবাহন ব্যবস্থাও ছিল অচল। শুধু ঢাকা শহর নয়, পূর্ব বাংলার সর্বত্রই ধর্মঘটে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেন ছাত্র-জনতা।

www.phulkuri.org.bd

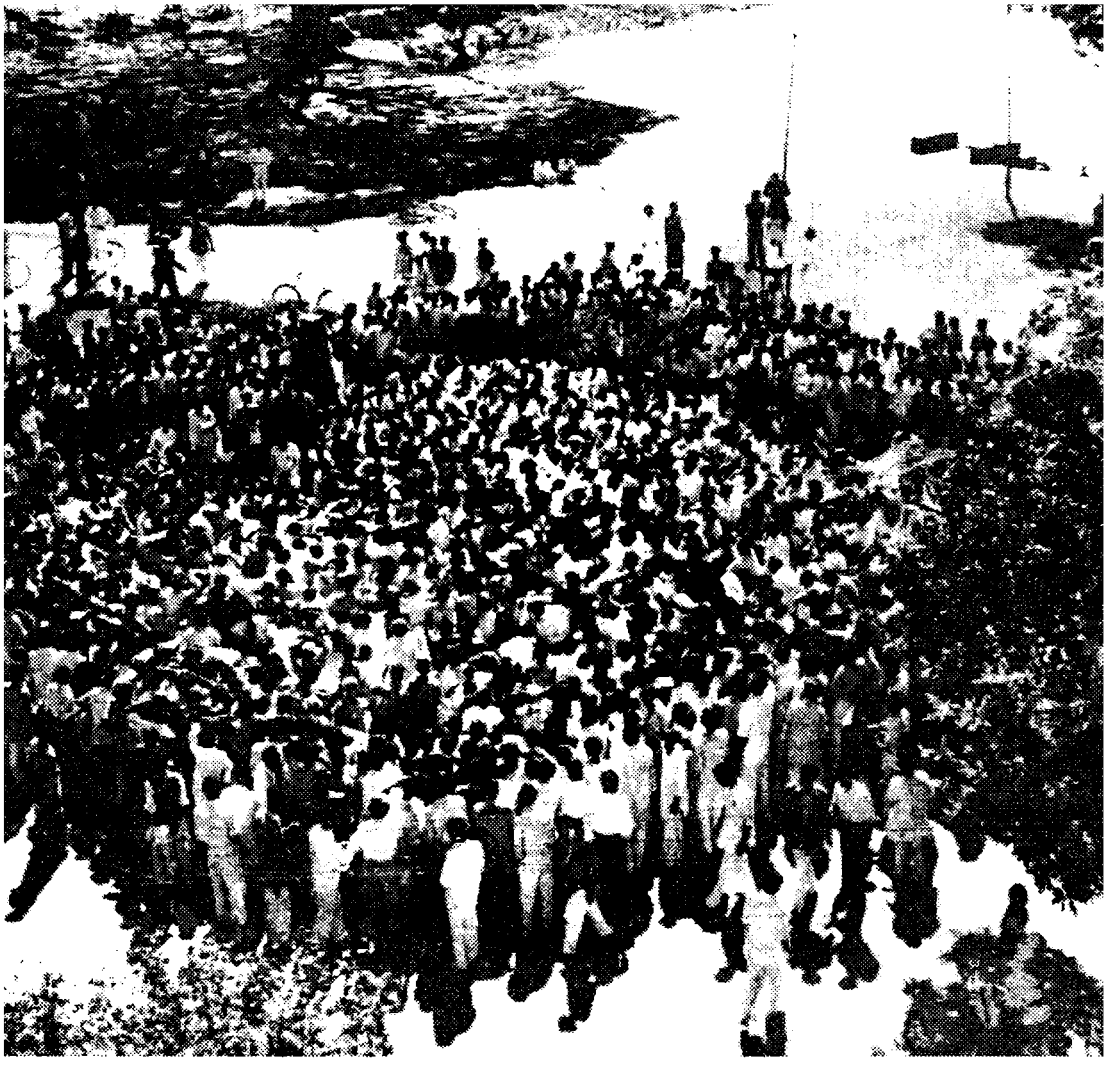

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ঐতিহাসিক ছাত্র-সমাবেশ

এদিকে ২১শে ফেব্রুয়ারি সকাল ৮.০০ টা থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল ও শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জড়ো হতে থাকেন। সকাল ১০.০০ টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। ছাত্র গণ-জমায়েতের সঙ্গে মিল রেখে পুলিশও মোতায়েন করা হয় বিপুল সংখ্যায়। পুলিশেরা বিশ্ববিদ্যালয় গেট বন্ধ করে রাখে মোটা রশি দিয়ে। ছাত্রদের মধ্যে টানটান উত্তেজনা।

এই অবস্থায় বেলা ১১.০০ টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় শুরু হয় ছাত্রদের সভা। সভার সভাপতি করা হয় গাজীউল হককে। প্রথমে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন শামসুল হক। তিনি পরিষদের আগের দিনের সভার আলোচনার সূত্র ধরে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন। কিন্তু ছাত্ররা তাঁর এই বক্তব্য বিরক্তির সঙ্গে

www.phunkuri.org.bd

প্রত্যাখ্যান করে চিৎকার করতে থাকেন। অবশ্য আবদুল মতিন, অলি আহাদ, গাজীউল হক প্রমুখ বক্তারা ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

এভাবে ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয় যে, ছাত্ররা এক এক দলে আট/দশ জন করে ভাগ হয়ে খণ্ড খণ্ড মিছিল বের করবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় গেট থেকে বের হয়ে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের দিকে অগ্রসর হবেন। মিছিলের গন্তব্য মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল নির্ধারণ করারও একটি বড় কারণ ছিল। কারণ ওই হোস্টেলটি ছিল পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদ ভবনের (বর্তমান জগন্নাথ হল ছাত্রাবাস) একেবারে কাছে। আর সেদিন ছিল প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন। কাজেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে মিছিল নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত কেবল ১৪৪ ধারা ভাঙার নজির স্থাপনের জন্য নয়, সরকারি প্রতিনিধিদের কাছে বাংলা ভাষার দাবি সরাসরি তুলে ধরাই ছিল আসল উদ্দেশ্য।

উপস্থিত ছাত্ররা মোটামুটি প্রস্তুত। ইস্পাত-কঠিন তাদের মূর্তি। আজ কোনো বাধা ফেরাতে পারবে না তাদের। ১৪৪ ধারা তারা ভাঙবেনই।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে বের হবার মুখেই শুরু হয় ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ। উভয়ের মধ্যে ছোঁড়াছুঁড়ি হয় ইটপাটকেল। তারপর ছাত্রদের দিকে পুলিশ নিক্ষেপ করে কাঁদানে গ্যাস। সেই টিয়ার শেলের আঘাতে গাজীউল হক অজ্ঞান হয়ে যান। তবু ছাত্ররা পিছু হটতে নারাজ।

বেলা ১২.০০টার দিকে ছাত্ররা দলে দলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে আসতে থাকেন। প্রথম তিনটি খণ্ড মিছিল থেকে প্রায় এক শ'জন ছাত্রকে পুলিশ গ্রেফতার করে তুলে নেয় ট্রাকে। এতে ছাত্রদের মধ্যে আরো উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। ছাত্রদের সঙ্গে ছাত্রীরাও যোগ দেন। চতুর্থ খণ্ড মিছিলটি বের করেন ছাত্রীরা। পুলিশ মিছিল ঠেকানোর জন্য কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়তে থাকে। ছাত্রছাত্রীদের বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই সেদিকে। তারা তখন ১৪৪ ধারা ভাঙার উদ্দাম মিছিলে উত্তাল।

পরিস্থিতি পুরোপুরি বেসামাল। পুলিশ মুহুর্মুহু কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু করে লাঠিচার্জ। একদিকে কাঁদানে গ্যাসের জ্বালাময় ধোঁয়া, অন্যদিকে লাঠির নির্মম আঘাত। ছাত্র-ছাত্রীরা দৌড়াদৌড়ি শুরু করেন অসহায়ের মতো। ছুটতে থাকেন এদিক ওদিক।

এরই মধ্যে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই পুলিশেরা ঢুকে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। এলোপাথাড়ি লাঠিচার্জ করে এগিয়ে যেতে থাকে সামনে। এই পুলিশী তাণ্ডবে পুরো সমাবেশ ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় একসময়।

কিন্তু ছত্রভঙ্গ ছাত্র-ছাত্রীরা কেউ ফিরে যান নি নিজেদের বাসা-বাড়িতে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ছেড়ে তারা ক্রমে জড়ো হতে থাকেন মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের ভেতরে। তাদের সঙ্গে মেডিক্যাল কলেজের ওয়ার্ড বয়-বেয়ারা, মেডিক্যাল হোস্টেল সংলগ্ন রাস্তার পাশের হোটেল রেস্টুরেন্টের বয়-বেয়ারা, পথচারী আর রিক্সাওয়ালারাও যোগ দেয়। ফলে এ আন্দোলন ছাত্র-জনতার আন্দোলনে রূপ নেয়।

মেডিক্যাল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় মাঠের কোনায় রাস্তার মোড়ে পুলিশেরা ঘাঁটি স্থাপন করে আর প্রাদেশিক ভবনের প্রবেশ-পথে কাঁটাতারের ব্যারিকেড দিয়ে রাখে, যাতে ছাত্ররা ওদিকে অগ্রসর হতে না পারেন। এ সময় সেখানে পুলিশের ডি. আই. জি., জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপারিন্টেডেন্টসহ অনেক উচ্চপদস্থ পুলিশ ও সরকারি কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

বেলা ৩.০০ টার দিকে এখানকার পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ছাত্ররা পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদ ও বাংলা ভাষার দাবি পেশ করার জন্য পরিষদ ভবনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকেন। এ সময় পুলিশেরা বারবার কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ ও ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জ করতে শুরু করে। এক পর্যায়ে তারা মেডিক্যাল হোস্টেলে প্রবেশ করে আক্রমণের চেষ্টা চালায়। উত্তেজিত বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা তখন দফায় দফায় পুলিশদের দিকে ইট-পাটকেল ছুঁড়তে থাকেন। এই পর্যায়ে পুলিশেরা ছাত্রদের সতর্ক করার জন্য কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি চালায়। কিন্তু ছাত্ররা সত্যি সত্যি গুলি চালাচ্ছে মনে করে প্রথমে হোস্টেলের বেড়ার শেডগুলোর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই হোস্টেলের মেঝে ও দেয়ালের নিচের অংশে দুই ফুট পর্যন্ত ছিল পাকা। দেয়ালের উপরের অংশ বেড়া হওয়ায় ছাত্ররা মেঝের উপর শুয়ে পড়েন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা বুঝতে পারেন যে, পুলিশ ফাঁকা গুলি করেছে। অমনি ছাত্ররা হোস্টেলের শেডের ভেতর থেকে বেরিয়ে আবার এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়েন এবং ছাত্রদের একটা অংশ গেটের দিকে এগিয়ে যান। পুলিশ এই আগুয়ান ছাত্রদের লক্ষ করে এবার সত্যি সত্যি গুলি ছোঁড়ে। গুলিতে হতাহত হন অনেক ছাত্র-জনতা। গুলির শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই ঝরে পড়ে অনেক তাজা-তরুণ প্রাণ।

২১শে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় প্রকাশিত 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকার টেলিগ্রাফ ও পরদিন ২২শে ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত সংখ্যা থেকে জানা যায় যে, ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩জন ছাত্রসহ ৪ ব্যক্তি নিহত ও ১৭ ব্যক্তি আহত হন। তবে ধারণা করা হয় নিহতের সংখ্যা আরো বেশি। পুলিশ রাস্তা ও বিশ্ববিদ্যালয় মাঠ থেকে কয়েক জনের লাশ সরিয়ে নিয়েছিল বলে জানা যায়। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গ থেকেও সেদিন রাতে পুলিশ কিছু লাশ গুম করে দেয়। নিহতদের মধ্যে যাদের নাম জানা যায় তারা হলেন—রফিকউদ্দিন আহমদ, আবদুল জব্বার ও আবুল বরকত। এদের লাশও পুলিশের তত্ত্বাবধানে গভীর রাতে গোপনে আজিমপুর গোরস্থানে দাফন করা হয়। একজন কিশোর বালকও সেদিন নিহত হয়েছিল বলে শোনা যায়। মেডিক্যাল কলেজ ও পরিষদ ভবনের মাঝামাঝি জায়গায় বালকটি গুলিবিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ তার লাশ সরিয়ে নেয়। আহতদের মধ্যে আখতারুজ্জামান নামে ১১ বছর বয়সী এক কিশোরও ছিল। সুতরাং মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে এ দেশের কিশোরেরাও রেখেছে উজ্জ্বল ভূমিকা।

মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের গেটে যখন গুলি চালানো হয় তখন পূর্ব বাংলা পরিষদ ভবনে মুসলিম লীগ সংসদীয় দলের বৈঠক চলছিল। বৈঠকে সদস্যদের জানানো হয় যে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর ছাত্ররা পরিষদ ভবনের সামনে গিয়ে হাজির হয় এবং চিৎকার করে সদস্যদের বাইরে বেরিয়ে আসার আহবান জানাতে থাকেন।

এই অবস্থার মধ্যেই স্পিকার আবদুল করিম পরিষদের মূল অধিবেশন শুরু করেন। মুসলিম লীগের সদস্য মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ অধিবেশন বন্ধ করে বাইরের পরিস্থিতি

www.phulkuri.org.bd

পর্যবেক্ষণ ও তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থল পরিদর্শনের জন্য মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীনকে আহবান জানান। কংগ্রেস দলের শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মনোরঞ্জন ধর, গোবিন্দলাল ব্যানার্জী, বসন্ত কুমার দাস, শামসুদ্দীন আহমদ সদস্যবৃন্দ তর্কবাগীশকে সমর্থন করেন। মুখ্যমন্ত্রী লোক নিহত হওয়ার বিষয় অস্বীকার করে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আপত্তি জানান। এই বিতর্কের মধ্যে স্পিকার ১৫ মিনিটের জন্য অধিবেশনের বিরতি ঘোষণা করেন। বিরতির পর মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন ঘটনাস্থল পরিদর্শনের দাবি মেনে না নিয়ে বিবৃতি দিতে শুরু করেন। কিন্তু অনেক সদস্যই মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতিতে মর্মাহত হন। তারা ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে অধিবেশন বর্জন করে বাইরে বেরিয়ে আসেন। তাদের মধ্যে প্রথম বেরিয়ে আসেন মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ। পরে তাকে অনুসরণ করেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন, খয়রাত হোসেন, আনোয়ারা খাতুন ও আলী আহমেদ খান। সদস্যদের অনেকেই সঙ্গে সঙ্গে মেডিক্যাল কলেজে আহত ছাত্রদের দেখতে যান এবং ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতি জানান।

২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এক চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। সবদিকে অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ে। অফিস আদালত দ্রুত বন্ধ হয়ে যায়। সেক্রেটারিয়েটের কর্মচারীরা কাজ ত্যাগ করে দলে দলে বেরিয়ে আসেন এবং বিক্ষোভে যোগ দেন। রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রের শিল্পীরা গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এতে ওই দিন সন্ধ্যার পর থেকে সব প্রোগ্রাম বাতিল হয়ে যায়। এই ধর্মঘটে ফররুখ আহমদ, সিকান্দার আবু জাফর, আবদুল আহাদ, আবদুল লতিফ প্রমুখ কবি-শিল্পীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

কিন্তু আন্দোলনের প্রতি সর্বস্তরের জন-সাধারণের এই স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনের কারণে সরকার আরো উগ্র মনোভাবের পরিচয় দিতে থাকে। ২১শে ফেব্রুয়ারি বিকেলেই সারা শহরে ব্যাপকভাবে পুলিশ ও সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়।

ঢাকার বাইরে বিভিন্ন শহরেও ২১শে ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট পালিত হয়। ঢাকায় ছাত্র-জনতার উপর গুলিবর্ষণের খবর পৌঁছলে বিভিন্ন জেলা শহরের জনগণের মধ্যেও প্রবল উত্তেজনা ও অসন্তোষ দেখা দেয়। নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, চট্টগ্রাম ইত্যাদি শহরে সভা, শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

এদিকে রাত্রে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির এক সভা বসে। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, পরদিন ২২শে ফেব্রুয়ারি সকাল ১০.০০টায় মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে শহীদদের জন্য এক গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মাইক দিয়ে এই ঘোষণা প্রচার করা হয়।

২২শে ফেব্রুয়ারিও ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকে। তবু এর মধ্যেই আন্দোলনের তীব্রতা আরো বৃদ্ধি পায়। একুশের ছাত্র হত্যা ও পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদে সেক্রেটারিয়েট ও এ. জি. বি. অফিসের কর্মচারীরা পূর্ণ ধর্ঘঘট পালন করেন এবং মিছিল সহকারে জানাজায় যোগ দেন। সেদিন ঢাকার রেল ওয়ার্কশপের শ্রমিক ও রেল কর্মচারীরা পূর্ণ ধর্মঘট পালন করেন। এর ফলে রেল চলাচল বন্ধ থাকে। সরকারি কর্মচারীদের এই ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকার পার্শ্ববর্তী

মাঞ্চলের কৃষকেরাও দলে দলে ঢাকা শহরে এসে গায়েবানা জানাজায় যোগ দেন এবং সরকার বিরোধী বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেন।

গায়েবানা জানাজার পর মেডিক্যাল হোস্টেল প্রাঙ্গণেই অনুষ্ঠিত হয় একটি সংক্ষিপ্ত জনসভা। জনসভার পর বের করা হয় একটি শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রায় যোগদান করেন হাজার হাজার ছাত্র-জনতা। ছাত্র-জনতার হাতে হাতে কালো পতাকা ছাড়াও ছিল শহীদদের রক্তাক্ত কাপড়-চোপড় দিয়ে তৈরি অনেকগুলো রক্ত-পাতাকা। আর তাদের মুখে মুখে ছিল মাতৃভাষা বাংলার স্বপক্ষে নানা স্লোগান। সেই সঙ্গে মুহুর্মুহু ধ্বনিত হচ্ছিল পুলিশী জুলুম ও ছাত্রহত্যার প্রতিবাদ এবং সরকারের পদত্যাগের দাবি। বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠ ছাড়িয়ে কার্জন হলের সামনে দিয়ে শোভাযাত্রাটি অগ্রসর হতে থাকে ক্রমে। পুরাতন হাইকোর্ট ভবনের সামনের রাস্তায়

পৌঁছলে পুলিশ শোভাযাত্রার উপর চড়াও হয় এবং এলোপাথাড়ি লাঠিচার্জ করতে শুরু করে। ফলে দীর্ঘ শোভাযাত্রাটি ছত্রভঙ্গ হয়ে শহরের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। শোভাযাত্রার এক অংশ অগ্রসর হয় নাজিমুদ্দিন রোড ধরে, আর একটি বড় অংশ অগ্রসর হয় নবাবপুর রোড ধরে।

নবাবপুর রোডের বংশাল মোড়েই ছিল সরকার সমর্থিত পত্রিকা 'সংবাদ' অফিস। ভাষা আন্দোলন ও একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনা বিকৃত করে প্রচারের কারণে ছাত্র-জনতা যে দুটি পত্রিকার উপর ক্ষুব্ধ ছিল তার একটি 'সংবাদ' এবং অন্যটি ইংরেজি দৈনিক 'মর্নিং নিউজ'। ২২শে ফেব্রুয়ারি সকালেই বিক্ষোভকারী জনতা ভিক্টোরিয়া পার্কের কাছে অবস্থিত 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকার প্রেস ও অফিস আক্রমণ করেন ও জ্বালিয়ে দেন। এই ঘটনায় 'সংবাদ' প্রত্রিকার কার্যালয়ে পুলিশ মোতায়েন করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। অর্থাৎ 'সংবাদ' কার্যালয় পাহারায় ছিল সশস্ত্র বাহিনী। নবাবপুর রোড ধরে এগিয়ে যাওয়া খণ্ড মিছিলটি যখন বংশাল রোডের মোড়ে 'সংবাদ' অফিসের কাছে পৌঁছে, তখন সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা মিছিলের গতিরোধ করে। এতে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা এবার রীতিমত ফুঁসে ওঠেন। তারা বাধা ডিঙিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকেন। এই অবস্থায় ট্রাকের উপর থেকে পুলিশ মিছিলে গুলিবর্ষণ করে। ঘটনাস্থলে অনেকেই হতাহত হন। এখানেই শহীদ হন হাইকোর্টের কর্মচারী শফিউর রহমান ও দশ বছরের কিশোর অহিউল্লাহ। এ দিন আবদুল আউয়াল নামে এক রিক্সাচালকও কার্জন হলের সামনের রাস্তায় পুলিশের আক্রমণে নিহত হন। নিহত হন নাম না জানা আরো কয়েক জন।

২২শে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় যথারীতি পূর্ব বাংলা পরিষদের অধিবেশন বসে। অধিবেশনে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য সরকারিভাবে একটি সুপারিশ প্রস্তাব গৃহীত হয়। মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন প্রস্তাবটি পেশ করেন।

কিন্তু এ দিনই 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকার সম্পাদক ও মুসলিম লীগ দলীয় পরিষদ সদস্য আবুল কালাম শামসুদ্দীন ২১শে ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিবর্ষণ ও সরকারের ভূমিকায় প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়ে পরিষদ সদস্যপদে ইস্তফা দেন।

২৩শে ফেব্রুয়ারিও ঢাকা শহরের অবস্থা ছিল একই রকম। থমথমে ও উত্তজনাপূর্ণ। পুলিশী নির্যাতনও অব্যাহত থাকে। ফুল-বাড়িয়া পশু হাসপাতালের নিকট পুলিশ জনতার উপর লাঠিচার্জ করে। এতে কয়েক জন গুরুতর আহত হন। এ দিন মুসলিম লীগ সংসদীয় দল থেকে মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ পদত্যাগ করেন এবং স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবে পরিষদে বসার সিদ্ধান্ত নেন।

তবে ২৩শে ফেব্রুয়ারির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল শহীদ মিনার নির্মাণ। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের যেসব বীর ২১শে ও ২২শে ফেব্রুয়ারি পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর নিষ্ঠুর গুলিতে প্রাণ দিয়েছেন, তাদের কারো লাশই আন্দোলনরত জনতা পান নি। শহীদদের কবর দেওয়া হয়েছে গোপনে রাতের আঁধারে। বরকত ও শফিউর রহমান ছাড়া অন্যদের কবরও সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় নি। বলতে গেলে অনেক শহীদের কবর হারিয়ে গেছে।

www.phulkuri.org.bd

একুশের পরের সমাবেশগুলোতে ছাত্র-জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্লোগান দিয়েছেন 'শহীদ স্মৃতি অমর হোক'। কিন্তু স্মৃতি কি আর এমনিতে অমর হয়? স্মৃতি অমর-অম্লান করে রাখার জন্য চাই প্রতীক। এই ভাবনা থেকেই সংগ্রামী ছাত্রছাত্রীদের মনে জাগে শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ বা শহীদ মিনার গড়ার স্বপ্ন। ২৩শে ফেব্রুয়ারি রাতেই মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে ছাত্র-জনতা মিলে গড়ে তোলেন প্রায় ১১ ফুট উচু একটি শহীদ মিনার। এর নকশা করেন মেডিক্যাল কলেজের তখনকার ছাত্র সাঈদ হায়দার আর রেখাচিত্র অঙ্কন করেন বদরুল আলম।

২৪শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহর অনেকটা শান্ত হয়ে আসে। তবু পুলিশ ও সামরিক বাহিনী সারাদিনই শহরের বিভিন্ন এলাকায় টহল দেয়। এ দিন বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তৃতা করেন মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, অর্থনীতি বিভাগের অধ্যক্ষ স্বামীনাথন আয়ার প্রমুখ। সভায় পুলিশ কর্তৃক ছাত্রহত্যার তীব্র নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানানো হয়।

এদিকে নবনির্মিত শহীদ মিনারটি ২৪শে ফেব্রুয়ারি তাৎক্ষণিক ও অনাড়ম্বরভাবে উদ্বোধন করানো হয়। উদ্বোধন করেন শহীদ শফিউর রহমানের পিতা মৌলভী মাহবুবুর রহমান। একদিন পর অর্থাৎ ২৬শে ফেব্রুয়ারি শহীদ মিনারটি আবার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করানো হয়। এবার উদ্বোধন করেন আজাদ পত্রিকার সম্পাদক ও পূর্ব বাংলা পরিষদ সদস্য পদে সদ্য ইস্তফা দানকারী রাজনীতিক আবুল কালাম শামসুদ্দীন। ২৪শে থেকে ২৬শে ফেব্রুয়ারির মধ্যেই এই শহীদ মিনারের খবর শহরময় ছড়িয়ে পড়ে। এটি হয়ে ওঠে এ দেশের মানুষের তীর্থকেন্দ্র। ফুল দিয়ে শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে লোকেরা হাজির হতে থাকে দলে দলে। যুবক বৃদ্ধ নারী-পুরুষ সবার যেন এক বাঁধ ভাঙা স্রোত।

কিন্তু এ দেশের মানুষের এই নব জাগরণ শাসকগোষ্ঠীর চোখে জ্বালা ধরায় আবার। শহীদ মিনারকে মেনে নিতে পারে নি তারা। ২৬শে ফেব্রুয়ারি বিকেলেই সরকারের সশস্ত্র বাহিনী গুঁড়িয়ে দেয় বাঙালির প্রথম শহীদ মিনার। এতে ছাত্র-জনতার মধ্যে নতুন করে ক্ষোভের সঞ্চার হয়।

কিন্তু সরকার দমননীতি চালিয়ে যেতেই থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ২৬শে ফেব্রুয়ারি পুলিশ পূর্ব বাংলা পরিষদের সদস্য সতীন সেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্তী, মুনীর চৌধুরী ও জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক অজিত গুহকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়। এই অবস্থায় ২৭শে ফেব্রুয়ারি বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং ছাত্রছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ প্রদান করা হয়।

এভাবে সরকারের প্রচণ্ড দমননীতি, নানা মিথ্যা প্রচার ও কূট-কৌশলী ষড়যন্ত্রের মুখে ১৯৫২ সালের মার্চের প্রথম দিকে আন্দোলন একেবারে থেমে যায়। তবু ছাত্র-যুব-সমাজ ১৯৫৩ সাল থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারি দিনটিকে 'শহীদ দিবস' হিসেবে পালন করতে থাকেন।

এভাবে ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নিলেও ভাষার দাবি তখনি পুরোপুরি আদায় হয় নি। তবে ২১শে ফেব্রুয়ারি রক্তাক্ত সংগ্রামের ফলে ছাত্রদের বাংলা ভাষার দাবি জনগণের দাবিতে

পরিণত হয়। জাতি ধর্ম বর্ণ শ্রেণী পেশা নির্বিশেষে দেশের সকল মানুষ এ দাবির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষার দাবিই এ দেশের মানুষকে আত্মসচেতন করে তোলে এবং গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে।

২১শে ফেব্রুয়ারি থেকেই সৃষ্টি হয় ঐতিহাসিক ২১ দফা। ২১ দফাকে ভিত্তি করে ১৯৫৪ সালে গঠিত হয় রাজনৈতিক যুক্তফ্রন্ট। এ বছর সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। ২১ দফার অন্যতম দাবি অনুযায়ীই বাংলা ভাষার প্রচার ও প্রসারের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন 'বর্ধমান হাউস'-এ ১৯৫৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠা করা হয় বাংলা একাডেমী। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলা ভাষার দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। ১৯৫৬ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারি ঘোষণা দেওয়া হয় যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু ও বাংলা।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি যে আন্দোলনের সূচনা হয় তার প্রভাব ছিল অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক। এ আন্দোলন ভাষার দাবিতে শুরু হলেও তা শুধুমাত্র বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি। ২১শে ফেব্রুয়ারি থেকে যে নির্যাতন শুরু হয় তার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী এমন এক আন্দোলন গড়ে ওঠে, যার লক্ষ্য শুধু ভাষার দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করা নয়, বরং তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকারের পতনও সেই সঙ্গে নানা ধরনের শোষণ-নির্যাতনের অবসান ঘটানো। একুশের চেতনা থেকেই উন্মেষ ঘটে নতুন এক জাতীয়তাবাদের—পরবর্তী কালে যার থেকে উদ্ভব হয় বাংলাদেশ রাষ্ট্রের। সুতরাং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূত্রপাতের দিনই হল ২১শে ফেব্রুয়ারি। ১৯৫২ সালের এ দিনটিতেই বোঝা গিয়েছিল পৃথিবীতে একটি নতুন দেশের জন্ম আসন্ন। উনিশ বছর পর জন্ম নেয় সে দেশটি। পৃথিবীর সেই অনন্য দেশের নাম বাংলাদেশ, যার জন্মের মূলে কাজ করেছে ভাষা, যার নাম ভাষার নামে। বাংলা দেশ। ভাষা বাংলা, দেশও বাংলা। এমন দেশ কি পৃথিবীতে তার একটিও আছে?

www.phulkuri.org.bd

হাসিমুখে যারা দিয়ে গেল প্রাণ

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই সূত্রপাত ঘটে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের। ১৯৫২ সালের পর ১৯৫৪, ১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৬৯ সালের আন্দোলনের পরম পরিণতি হল ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ। তাই ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনকে যদি আমরা আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা ধরি, তা হলে এই আন্দোলনের শহীদেরাই আমাদের স্বাধীনতার প্রথম শহীদ। তারাই বুকের রক্ত দিয়ে স্থাপন করেন স্বাধীনতার ভিত্তি প্রস্তব। এই শহীদদের পরিচয় আমাদের জানা বড় প্রয়োজন।

কিন্তু ভাষা আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছেন, তাঁদের সবার নাম-পরিচয় পাওয়া যায় নি। কিছু শহীদের লাশ পুলিশেরা সরিয়ে নিয়েছিল ঘটনাস্থল থেকে। কিছু লাশ পুলিশেরাই কবর দিয়েছিল রাতের অন্ধকারে। কারণ শাসকগোষ্ঠীর ভয় ছিল—মৃত্যুর খবর সঙ্গে সঙ্গে জানাজানি হলে এবং শহীদদের লাশ জনতার হাতে ফিরিয়ে দিলে আন্দোলন আরো জোরদার হয়ে উঠবে। কিন্তু এত অপচেষ্টার পরও সরকার সব শহীদের মৃত্যু-তথ্য গোপন করতে পারে নি। শেষ পর্যন্ত ১৯৫২ সালের ২১শে ও ২২শে ফেব্রুয়ারির কয়েক জন শহীদের নাম পরিচয় পাওয়া গেছে। তারা হলেন রফিকউদ্দিন আহমদ, আবদুল জব্বার, আবুল বরকত আবদুস সালাম, শফিউর রহমান, আবদুল আউয়াল, অহিউল্লাহ। আমরা এখন এদের প্রত্যেকের জীবন সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব।

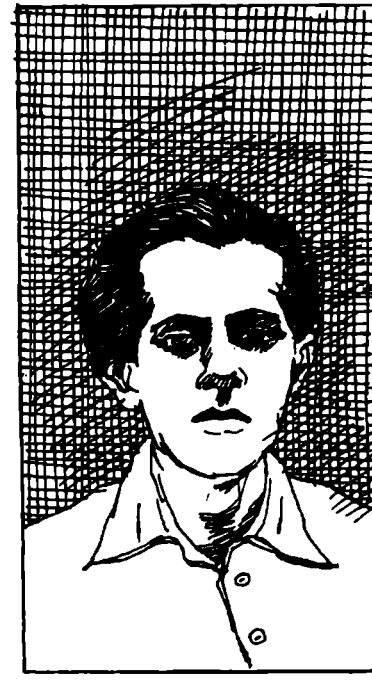

রফিকউদ্দিন আহমদ

রফিকউদ্দিন আহমদ : শহীদ রফিকউদ্দিন আহমদের জন্ম মানিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইর থানার পারিলগ্রামে, ১৯২৬ সালের ৩০শে অক্টোবর তারিখে। পিতা আবদুল লতিফ ও মাতা রাফিজা খাতুন। মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজের আই. কম. দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। পড়াশোনার পাশাপাশি নিজেদের ছাপাখানার কাজ তত্ত্বাবধান করতেন। এই কাজে তাকে প্রায়ই ঢাকায় আসতে হত। কারণ তাদের ছাপাখানা ছিল ঢাকার বাবু বাজার এলাকার আকমল খাঁ রোডে। ছাপাখানার নাম ছিল 'পারিল প্রিন্টিং প্রেস'। পরে এই নাম পাল্টে রাখা হয় 'কমার্শিয়াল প্রেস।'

www.phulkuri.org.bd

নিয়মিত ঢাকা আসা যাওয়ার কারণে রফিকউদ্দিন আহমদ ভাষা আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন। ছাত্র সুলভ আকর্ষণে তিনি ২১শে ফেব্রুয়ারি মেডিক্যাল হোস্টেল প্রাঙ্গণে ছাত্রদের সঙ্গে যোগ দেন। এখানে বেলা ৩.০০ টার দিকে ছাত্র-বিক্ষোভের সময় তিনি মাথায় গুলিবিদ্ধ হন এবং তার মগজ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। তিনি ঘটনাস্থলেই শহীদ হন। সম্ভবত তিনিই ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহীদ। তার রক্তাক্ত লাশ স্ট্রেচারে করে প্রথমে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে, পরে মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়। ওই দিনই গভীর রাতে পুলিশ পাহারায় তার লাশ আজিমপুর গোরস্থানে দাফন করা হয়। কিন্তু পরে তার কবর শনাক্ত করা সম্ভব হয় নি।

১৯৫২ সালের ২৭শে মার্চ (কারো মতে ২৮শে মার্চ) রফিকউদ্দিন আহমদের মামাতো ভাই মশাররফ হোসেন খান ঢাকা সদর মহকুমা হাকিম এন. আহমদের এজলাসে রফিকউদ্দিন আহমদকে গুলি করে মারার অপরাধে ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কোরেশী, সিটি এস. পি. মাসুদ মাহমুদ, পুলিশের ডি. আই. জি. এ. জেড. ওবায়দুল্লাহর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। কিন্তু হাকিম এন. আহমদ মামলা গ্রহণ করেন নি।

আবদুল জব্বার : শহীদ আবদুল জব্বারের জন্ম ১৯১৯ সালে, ময়মনসিংহ জেলার গফরগাওঁ থানার পাঁচুয়া গ্রামে। পিতার নাম আবদুল কাদের। আবদুল জব্বারের পেশা সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু জানা যায় নি। সরকারি ভাষ্যে তার পেশা দর্জি উল্লেখ থাকলেও অন্য মতে তার পেশা গৃহস্থালি, তিনি গ্রামে কৃষিকাজ করতেন। কেউ কেউ আবার তাকে রিক্সাচালক বলেও উল্লেখ করেছেন।

আবুল বরকত

আবদুল জব্বার অসুস্থ শাশুড়ির চিকিৎসা করানোর জন্য ২৩শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা আসেন। শাশুড়িকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানোর পর গফরগাওঁয়ের এক ছাত্রের পরিচয়-সূত্রে আবদুল জব্বার ২১শে ফেব্রুয়ারি মেডিক্যাল হোস্টেলেই ছিলেন। সেদিন দুপুরে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষের সময় তিনি হোস্টেলের ২০ নম্বর শেডের ৮ নম্বর কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসার পর গুলিতে আহত হন। তার তলপেটে গুলি লাগে। হাসপাতালে নেওয়ার পর পরই তিনি মারা যান। সম্ভবত তিনি ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় শহীদ।

পুলিশ আবদুল জব্বারের লাশ কোথায় দাফন করে সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় নি।

আবুল বরকত : শহীদ আবুল বরকতের জন্ম পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বাবলা গ্রামে, ১৯২৭ সালের ১৬ই জুন। তার পিতা শামসুদ্দিন ও মাতা হাসিনা বেগম।

১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর আবুল বরকত ঢাকায় চলে আসেন। তার মামা আবদুল মালেকের বাসায় থেকে

www.phulkuri.org.bd

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতেন। ১৯৪৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে অনার্স কোর্সে ভর্তি হন। ১৯৫১ সালে তিনি অনার্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। ১৯৫২ সালে তিনি ছিলেন এম. এ. ক্লাসের ছাত্র।

২১শে ফেব্রুয়ারি দুপুরে ছাত্র বিক্ষোভ চলাকালে আবুল বরকত ছিলেন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের ১২ নম্বর শেডের বারান্দায়। এখানে দাঁড়ানো অবস্থায় উরুতে গুলিবিদ্ধ হয়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে তাকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। রাত ৮.০০ টার দিকে হাসপাতালেই তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

গভীর রাতে কড়া পুলিশ পাহারায় আবুল বরকতের লাশ আজিমপুর গোরস্থানে দাফন করা হয়। তার আত্মীয়-পরিজনের চেষ্টায় কবরটি পাকা করা হয়। তার কবরের ফলকে লেখা আছে।

২১শে ফেব্রুয়ারি
ভাষা আন্দোলনের শহীদ
আবুল বরকত (এম. এ. ক্লাস)
বাবলা, মুর্শিদাবাদ
জন্ম : ১৬ - ৬ - ২৭ ইং.

আবদুস সালাম : শহীদ আবদুস সালামের জন্ম বর্তমান ফেনী জেলার লক্ষ্মনপুর গ্রামে, ১৯২৫ সালে। পিতা মোহাম্মদ ফাজিল মিয়া। আবদুস সালাম ছিলেন পূর্ববঙ্গ সরকারের শিল্প অধিদপ্তরের একজন পিওন। কর্মস্থল ছিল সেক্রেটারিয়েট।

আবদুস সালাম ২১শে ফেব্রুয়ারি দুপুরে মেডিক্যাল কলেজের সামনে পুলিশের গুলিতে গুরুতর আহত হন। তাকে সঙ্গে সঙ্গে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রায় দেড় মাস মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে ৭ই এপ্রিল তিনি মারা যান। তাকে কোথায় দাফন করা হয়েছে সে সম্পর্কে কোনো তথ্য জানা যায় না।

শফিউর রহমান : শফিউর রহমানের জন্ম পশ্চিমবঙ্গ হুগলি জেলার কোন্নগড়ে, ১৯১৮ সালের ২৪শে জানুয়ারি। পিতা মৌলভী মাহবুবুর রহমান। শফিউর রহমান কলকাতা গভর্নমেন্ট কমার্শিয়াল কলেজ থেকে আই. কম. পাশ করেন। এরপর তিনি চব্বিশ পরগণার সিভিল সাপ্লাই অফিসে চাকরি নেন। কিন্তু ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর সপরিবারে ঢাকায় চলে আসেন এবং ঢাকা হাইকোর্টে চাকরি গ্রহণ করেন। ঢাকায় তার বাসা ছিল হেমেন্দ্রদাস রোডে।

শফিউর রহমান

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্র সমাবেশে গুলিবর্ষণ ও ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে দেশের মানুষ যখন আরো সোচ্চার ও বেসামাল হয়ে ওঠে, তখন সরকার

www.phulkuri.org.bd

পুলিশের সঙ্গে সশস্ত্র বাহিনীও মোতায়োন করে। তারা দমনপীড়ন অব্যাহত রাখে। ২২শে ফেব্রুয়ারি বেলা ১১.০০ টার দিকে নবাবপুর রোডের বংশাল মোড়ে 'সংবাদ' পত্রিকা অফিসের কাছে একটি খণ্ড মিছিলে সরকারের সশস্ত্র বাহিনী গুলিবর্ষণ করে। এ সময় এ পথ দিয়েই সাইকেলে চড়ে অফিসে যাচ্ছিলেন শফিউর রহমান। এখানেই তার পিঠে বুলেট বিদ্ধ হয়। তাকে সঙ্গে সঙ্গে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কর্তব্যরত ডাক্তারেরা তার দেহে অস্ত্রোপচার করেন। কিন্তু সকলের চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

গভীর রাতে পুলিশ শফিউর রহমানের লাশ আজিমপুর গোরস্থানে দাফন করে। তবে তার কবর সংরক্ষণ করা হয়েছে। সমাধিলিপিটি নিম্নরূপ :

শহীদ
শফিউর রহমান
২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২

আবদুল আউয়াল : শহীদ আবদুল আউয়াল সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি। তার পিতার নাম মোহাম্মদ হাশেম। ২২শে ফেব্রুয়ারি শোক মিছিলে অনেকের মতো আবদুল আউয়ালও যোগ দিয়েছিলেন। মিছিলটি কার্জন হলের সামনের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় সম্ভবত সামরিক বাহিনীর ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে তার মৃত্যু হয়। কোথায় তাকে দাফন করা হয়েছে সে সম্পর্কে কিছু জানা যায় নি।

অহিউল্লাহ : অহিউল্লাহ ভাষা আন্দোলনের একজন কিশোর শহীদ। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল দশ। তার পিতা কাঠমিস্ত্রী হাবিবুর রহমান। ২২শে ফেব্রুয়ারি নবাবপুর রোডের বংশাল মোড়ে খণ্ড মিছিলে অহিউল্লাহর গায়ে সশস্ত্র বাহিনীর গুলি লাগে এবং ঘটনাস্থলেই তিনি নিহত হন। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ তার লাশ গুম করে ফেলে। তার সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু জানা যায় নি।

রফিক, জব্বার, বরকত, সালাম, শফিউর, আউয়াল, অহিউল্লাহ এমনি আরো কত মানুষ বাংলা ভাষার দাবিতে শহীদ হয়েছেন। তাদের সবার নাম আমরা জানতে পারি নি। ইতিহাসে তাদের নাম না থাকলেও তারা হারিয়ে যান নি। তারা বেঁচে আছেন একুশের স্মৃতিতে। তাদের সবার অবদানেই ২১শে ফেব্রুয়ারি এমন উজ্জ্বল হয়েছে। তাদের সবার বুকের রক্তে রঞ্জিত হয়েই দিনপঞ্জির একটি সাধারণ তারিখ থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারি হয়ে উঠেছে অসাধারণ। ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখেই তারা বপন করেছিলেন আমাদের স্বাধীনতার বীজ। তাদের আত্মত্যাগে আমাদের মাতৃভাষা বাংলা কেবল রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাই পায় নি, বাংলা নামে একটি স্বাধীন দেশেরও জন্ম হয়েছে। বাংলা আজ বিশ্ব জয় করেছে। বিশ্ববাসী বাংলাকে জেনেছে, বাংলাদেশকে চিনেছে। বাংলার 'শহীদ দিবস' ২১শে ফেব্রুয়ারি আজ পেয়েছে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' এর স্বীকৃতি। অমর একুশের শহীদানের জন্যই আমরা পেয়েছি এই অনন্য গৌরব। তাই একুশের শহীদেরা কেবল শহীদ নন, তারা আমাদের মহান বীর। তাদের রক্তের ঋণ কোনোদিনও আমরা শোধ করতে পারব না। তবে আমরা আজীবন তাদের স্মরণ রাখতে পারি এবং শ্রদ্ধা করতে পারি। আমাদের নতুন প্রজন্মকে শোনাতে পারি তাদের বিজয়-গাথা। এভাবেই হয়তো আমরা দিতে পারি তাদের ভালোবাসার কিছুটা প্রতিদান।

www.phulkuri.org.bd

স্মৃতির মিনার শহীদ মিনার

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির মতো শোক-বিহ্বল ঘটনা আমাদের জীবনে আগে তার ঘটে নি। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়ন নির্যাতনে গোটা জাতি সেদিন নির্বাক হয়ে পড়েছিল। স্বজন হারানোর বেদনায় তারা হারিয়ে ফেলেছিল ভাষা। সংগ্রামী ছাত্র-জনতা তাই স্বজন হারানোর স্মৃতিকে সেদিন ধরে রাখতে চেয়েছিল একটি প্রতীকের মধ্য দিয়ে। সেই প্রতীকের নাম শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ বা শহীদ মিনার—শহীদদের রক্তের অম্লান সাক্ষী। কিন্তু এ মিনার যেন এ দেশের মানুষের চোখের অশ্রুবিন্দু। এ দেশের মানুষের গভীর দুঃখের অশ্রু-সাগর থেকে জন্ম নিয়েছে এ মিনার।

১৯৫২ সাল থেকেই শহীদ মিনার হয়ে উঠেছে আমাদের তীর্থ। প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারিতে আমরা খালি পায়ে এ তীর্থে যাই। যান আমাদের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী। আমরা ফুল দিয়ে শহীদদের শ্রদ্ধা জানাই। বেদনার গান গাই। আমরা বেদনা-বিধূর হয়ে উঠি। আবার আমরা যখন সাহসী হতে চাই, প্রতিবাদ করতে চাই, অধিকার চাই, স্বাধীনতা চাই, দানবদের তাড়াতে চাই, তখনো আমরা এ তীর্থে যাই। আমরা এ তীর্থ থেকে সংগ্রহ করি আগুনের মতো সাহস। আমাদের সব সংগ্রামের অনুপ্রেরণার উৎস এ মিনার।

আমরা এখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের উত্তর-পশ্চিম কোণে বিশাল চত্বর জুড়ে ঝকঝকে পরিপাটি যে শহীদ মিনার দেখি তা কিন্তু একবারে তৈরি হয় নি। নানা পর্যায়ে অনেক পরিবর্তন পরিবর্ধনের মধ্য দিয়ে শহীদ মিনার এই শিল্পমণ্ডিত সুরম্য রূপ লাভ করেছে।

১৯৫২ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি রাতে নির্মিত প্রথম শহীদ মিনার

আমাদের বর্তমান শহীদ মিনারের কাঠামোর কিন্তু গভীর তাৎপর্য আছে। এই ব্যাখ্যা হয়তো আমরা অনেকেই জানি না। মিনার ও তার স্তম্ভগুলো আমাদের মাতৃভূমি, মাতৃভাষা তথা মা ও তার শহীদ সন্তানদের প্রতীক। অর্ধবৃত্তাকারে মা তার শহীদ সন্তানদের নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। এভাবে মা অনন্তকাল ধরে সন্তানদের রক্ষা করছেন, যারা তার মর্যাদা রক্ষার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। সন্তানদের এই মহান

www.phulkuri.org.bd

.ত্যাগের জন্য গৌরবান্বিত মা তাদের দোয়া করছেন প্রাণ ভরে। সন্তানদের আত্মত্যাগের মহিমায় মা একটু ঝুঁকেও পড়েছেন স্নেহের ভারে। আর দু'পাশে দুটি করে মোট চারটি সন্তানের মধ্য দিয়ে তিনি তার লক্ষ-কোটি সন্তানকে দেখতে পাচ্ছেন।

অবশ্য এই নকশা-কাঠামো নিয়ে শহীদ মিনার প্রথম বারেই নির্মিত হয় নি। এটি নির্মিত হয় অনেক পরে। এর আগে শহীদ মিনার নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে আরো দু'বার। সেসব ঘটনাও কম চমকপ্রদ নয়। আমরা এখানে তাও একটু জেনে নিতে পারি।

শহীদ মিনার প্রথম নির্মিত হয় ১৯৫২ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি। ২১শে ও ২২শে ফেব্রুয়ারি পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গুলিতে ছাত্র-জনতার মৃত্যু এবং তার প্রতিবাদে মিছিল-সমাবেশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্লোগান ধ্বনিত হয়—'শহীদ মিনার অমর হোক।' এই স্লোগানই সম্ভবত শহীদ মিনার নির্মাণে প্রেরণা যোগায়। মিনারের পরিকল্পনা, স্থান নির্বাচন ও নির্মাণ সবই মেডিক্যাল ছাত্রদের উদ্যোগে ও চেষ্টায় সম্পন্ন হয়। মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের যে জায়গাটা ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহীদ রফিকউদ্দিন আহমদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল, ঠিক সেখানটায় নির্মাণ করা হয় শহীদ মিনার। এ জায়গাটি ছিল মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের ১২ ও ১৩ নম্বর ব্যারাকের মাঝামাঝি। ২৩শে ফেব্রুয়ারি রাতেই ছাত্ররা মিনার নির্মাণের সমস্ত কাজ শেষ করেন। মিনারের উচ্চতা ছিল প্রায় ১১ ফুট আর চওড়া ছয় ফুট। মিনারের গায়ে লাগানো ফলকে লেখা ছিল 'শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ' যা পরে মুখে মুখে রূপান্তরিত হয়ে 'শহীদ মিনার'–এ পরিণত হয়। মিনারের নকশা করেন মেডিক্যাল কলেজের তখনকার ছাত্র সাঈদ হায়দার এবং রেখাচিত্র অঙ্কন করেন বদরুল আলম।

২৪শে ফেব্রুয়ারি সকালেই শহীদ মিনার নির্মাণের খবর ছড়িয়ে পড়ে শহরময়। এ মিনার এক ঝলক দেখার জন্য সেদিনই মানুষের ঢল নামে। ছাত্র যুবক বৃদ্ধ, কিশোর নারী পুরুষ সবাই আসতে থাকে দলে দলে। সবারই হৃদয়-মন কেমন এক আশ্চর্য আবেগ ও অনুভূতিতে পরিপূর্ণ। কারো হাতে ফুল, কারো হাতে টাকা, কারো চোখে টলটলে অশ্রু, আবার কারো চোখে মুখে জ্বলজ্বলে অহঙ্কার। একদিকে শোক আর অন্যদিকে শপথ।

এই আবেগঘন পরিবেশে ২৪শে ফেব্রুয়ারি সকালে তাৎক্ষণিকভাবে নবনির্মিত শহীদ মিনার উদ্বোধন করেন শহীদ শফিউর রহমানের পিতা মৌলভী মাহবুবুর রহমান। একদিন পর আবার তা উদ্বোধন করানো হয় আনুষ্ঠানিকভাবে। ২৬শে ফেব্রুয়ারি সকালে শহীদ মিনার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পদত্যাগকারী পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য ও দৈনিক আজাদ পত্রিকার সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন।

দু'দিনেই এ শহীদ মিনার হয়ে ওঠে বাঙালির তীর্থকেন্দ্র। কিন্তু শাসকগোষ্ঠীর কাছে তা মনে হয় ভয়ঙ্কর এক প্রতিরোধের প্রতীক। তাদের মনে হল জীবিত রফিক, জব্বার, সালাম, বরকতের চেয়ে শহীদ রফিক, জব্বার, সালাম, বরকতেরা অনেক বেশি শক্তিশালী আর অপ্রতিরোধ্য। তাই ২৬শে ফেব্রুয়ারি বিকেলেই সরকারের সশস্ত্র বাহিনী মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল ঘেরাও করে গুঁড়িয়ে দেয় আমাদের প্রথম শহীদ মিনার। ভাঙা খণ্ডগুলো পর্যন্ত তারা কুড়িয়ে নিয়ে যায় ট্রাকে তুলে। চোখের পলকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এ দেশের মানুষের আবেগময় ভালোবাসা ও অহঙ্কারের প্রতীকটি।

www.pathagar.org.bd

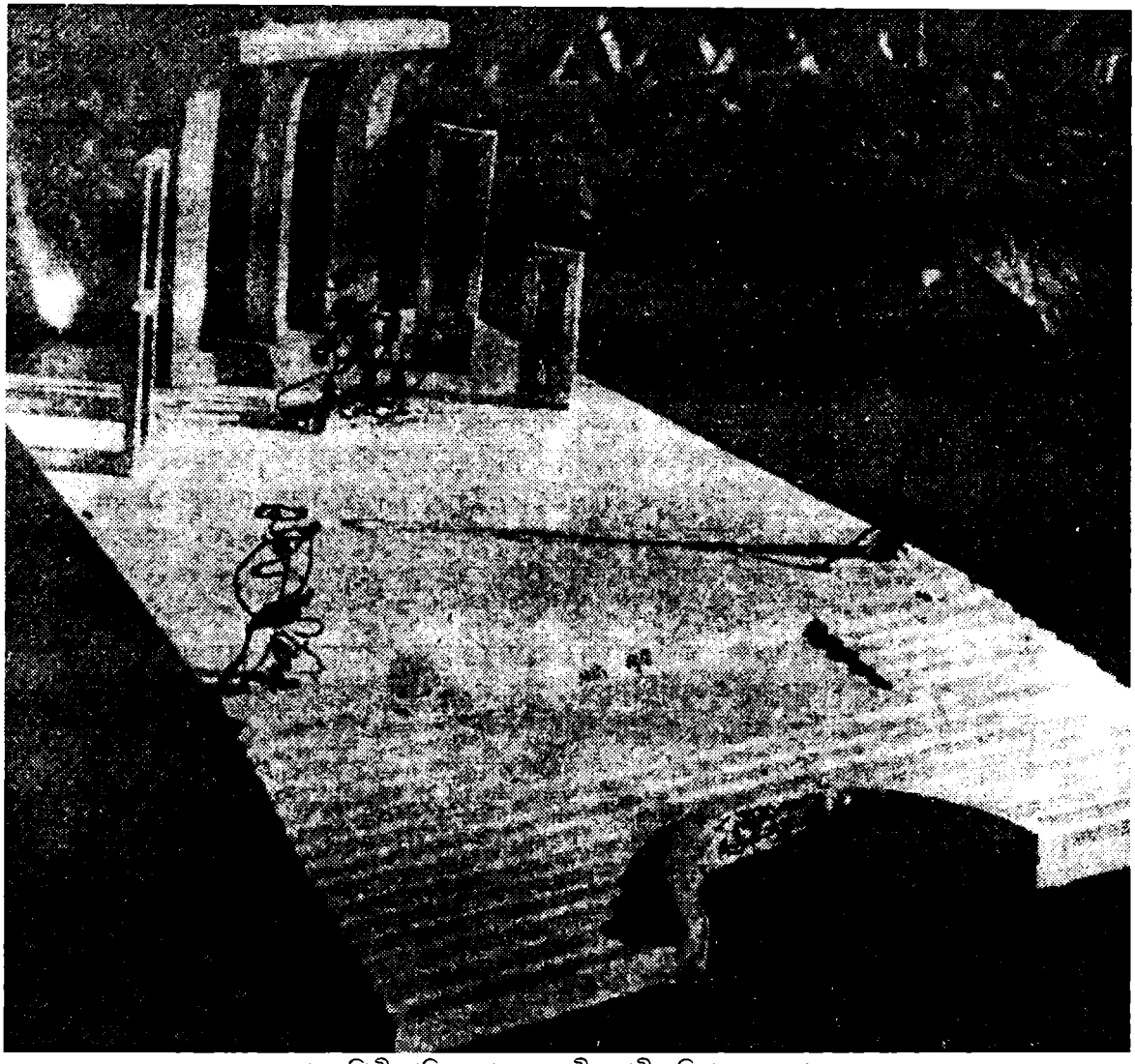

১৯৫৬ সালে শিল্পী হামিদুর রাহমান প্রণীত শহীদ মিনারের নকশা ও মডেল

কিন্তু শাসকগোষ্ঠী কি ভাঙতে পেরেছে আসল শহীদ মিনার? কেননা ততক্ষণে এ দেশের মানুষের মনের মণিকোঠায় গড়ে উঠেছে অসংখ্য শহীদ মিনার। কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ লিখেছেন– 'স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার? ..... ইটের মিনার ভেঙেছে ভাঙুক! একটি মিনার গড়েছি আমরা চার কোটি কারিগর ..... রাঙা হৃদয়ের বর্ণমালায়।'

আমাদের প্রথম শহীদ মিনার ভেঙে দেওয়ার পর সারা বাংলার শিক্ষাঙ্গনগুলোতে ছাত্ররা গড়ে তুলতে থাকে নতুন নতুন শহীদ মিনার।

এভাবে দু'বছর কেটে যায়।

১৯৫৪ সালে গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট সরকার। হক-ভাসানী সোহ্‌রাওয়ার্দির যুক্তফ্রন্ট সরকারের নির্বাচনের অঙ্গীকার ছিল—শহীদ মিনার নির্মাণ, একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'শহীদ দিবস' ঘোষণা,

www.pathagar.org.bd

বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা, মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীনের সরকারি বাসভবন 'বধর্মান হাউস'-এ বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকার একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'শহীদ দিবস' ও সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করেও তা কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়। শহীদ মিনার নির্মাণেরও আর অগ্রগতি হয় নি।

পাকিস্তান সরকার পঁয়তাল্লিশ দিনের মাথায় পূর্ব বাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দেয়। পঞ্চান্ন সালের আগস্ট মাসে সরকার গঠন করে কৃষক প্রজা পার্টি। এ সময় মেডিক্যাল হোস্টেল প্রাঙ্গণে আবার শহীদ মিনার নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং শহীদ মিনারের জন্য বর্তমান স্থানটি নির্বাচন করা হয়। ১৯৫৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সকাল ৯.০০ টায় মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং শহীদ আবুল বরকতের মা হাসিনা বেগম যুক্তভাবে শহীদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভাই ২১শে ফেব্রুয়ারিকে সরকারিভাবে 'শহীদ দিবস' ও সরকারি ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করেন।

আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভার আমলে শহীদ মিনারের স্থান নির্বাচন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হলেও শহীদ মিনারের পরিকল্পনা প্রণয়ন বা বাস্তবায়নের কাজ তেমন অগ্রসর হয় নি। কারণ ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতেই আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। এরপর আতাউর রহমান খান পূর্ব বাংলায় প্রথম আওয়ামী লীগ দলীয় সরকার গঠন করেন। এই সরকারের আমলেই শহীদ মিনারের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন অনেক দূর অগ্রসর হয়।

শহীদ মিনারের নকশা নির্বাচনের জন্য আতাউর রহমান খানের মন্ত্রিসভা একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটির সদস্যরা হলেন গ্রিক স্থপতি ডক্সিয়াডেস, প্রধান প্রকৌশলী জব্বার ও শিল্পী জয়নুল আবেদিন। কমিটি প্রতিযোগিতামূলক নকশা ও পরিকল্পনা আহ্বানের মধ্য দিয়ে শিল্পী হামিদুর রাহমানের নকশা গ্রহণ করে।

শিল্পী হামিদুর রাহমানের শহীদ মিনারের নকশা ছিল মা ও সন্তানের প্রতীক দিয়ে গড়া। মিনারের স্তম্ভগুলো মা ও সন্তানের প্রতীক। অর্ধ-বৃত্তাকারে মা দাঁড়িয়ে আছেন তার সন্তানদের নিয়ে। এভাবে মা অনন্ত কাল ধরে আগলে রাখছেন তার সন্তানদের। আসলে শহীদ মিনারের মাঝখানের স্তম্ভটি মা তথা বাংলাদেশ আর তার দু'পাশের চারটি স্তম্ভ সন্তান তথা জনগণের প্রতীক। শিল্পীর পরিকল্পনা ছিল স্তম্ভগুলোর মধ্যে অজস্র চোখের নকশা থাকবে। লেবু হলুদ আর গাঢ় নীল রঙের স্টেইন্ট গ্লাসে তৈরি হবে চোখগুলো। মিনারের সামনে প্রশস্ত জায়গাতে থাকবে মার্বেল পাথর। পুরো মিনারটির সামনে থাকবে একটি রেলিং। রেলিংটা আগাগোড়া তৈরি হবে বর্ণমালা দিয়ে। 'একুশে ফেব্রুয়ারি, তোমায় কি ভুলিতে পারি?—এই কথাটি বার বার রেলিংয়ে লেখা থাকবে। মিনারের সামনে থাকবে একটি সুন্দর ঝর্না, মিনারের গায়ের স্টেইন্ট গ্লাসের চোখ থেকে মেঝের মার্বেল পাথরে যে বর্ণালির ছটা পড়বে সেখানে রঙের একটি ঘড়ি থাকবে। ঘড়িতে সময়ের সংখ্যাগুলো থাকবে বাংলা হরফে। ঘড়িটা একেক ঘন্টায় পাল্টাবে একেক রঙ। যেমন ৮.০০ টায় যদি লাল হয়, ৯.০০ টায় তবে নীল। মিনারের ভিতরের কুঠুরিতে থাকবে এক হাজার স্কোয়ার ফুটের একটি মূল্যবান পেইন্টিং।

শিল্পী হামিদুর রাহমানের নকশা অনুযায়ী ১৯৫৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত কাজ চলে। এ সময় শিল্পী নভেরা আহমেদ শহীদ মিনারের জন্য তিনটি ভাস্কর্য নির্মানের কাজও শেষ করেন।

এই তিনটি ভাস্কর্যসহ ভিতমঞ্চ মিলিয়ে যখন শহীদ মিনারের আংশিক কাজ শেষ, তখন পতন ঘটে আতাউর খান সরকারের। এরপর দেশে শুরু হয় সামরিক শাসন এবং এই সঙ্গে শহীদ মিনার নির্মাণের কাজও হয়ে যায় বন্ধ।

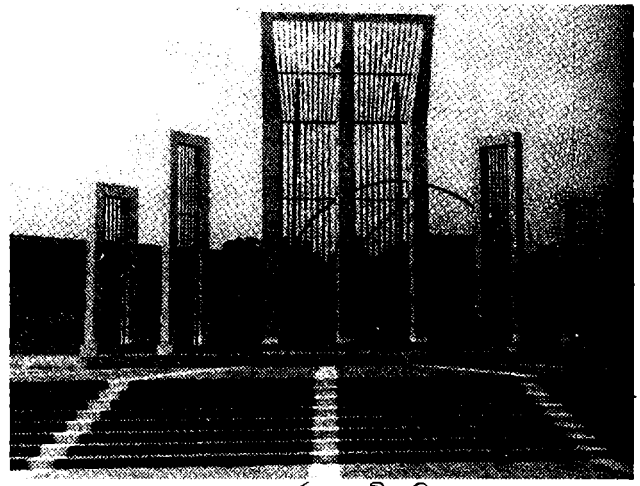

আমাদের বর্তমান শহীদ মিনার

১৯৬২ সাল পর্যন্ত ভিত-মঞ্চ ও অসম্পূর্ণ কয়েকটি স্তম্ভই ছিল এদেশের-শহীদ মিনার। তবু দেশের মানুষ কিন্তু শহীদদের শ্রদ্ধা জানানো থেকে বিরত থাকে নি। এই কয় বছর শহীদ দিবসে মানুষ ওখানেই ফুল দিয়েছে, সভা করেছে। আন্দোলনের শপথ নিয়েছে।

১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর লেফ্‌টেন্যান্ট জেনারেল আজম খান শহীদ মিনারের অসমাপ্ত কাজ শেষ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি শহীদ মিনার নির্মাণের জন্য চৌদ্দ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে দেন। কমিটির সভাপতি করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর ড. মাহমুদ হোসেনকে। সদস্যদের মধ্যে ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. মমতাজউদ্দিন আহমদ, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, শিল্পী জয়নুল আবেদিন, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, ড. কাজী মোতাহার হোসেন, অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই, ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, বাংলা একাডেমীর পরিচালক সৈয়দ আলী আহসান ও ইসলামিক একাডেমীর পরিচালক আবুল হাশিম। অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ছিলেন এই কমিটির সদস্য সম্পাদক। এই কমিটি শিল্পী হামিদুর রাহমানের ১৯৫৬ সালের নকশার ভিত্তিতে সংক্ষিপ্ত আকারে শহীদ মিনার নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

১৯৬৩ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় পর্যায়ে শহীদ মিনার নির্মাণের কাজ শেষ হয়। কিন্তু এই শহীদ মিনার শিল্পী হামিদুর রাহমানের মূল নকশা ভিত্তিক হলেও শহীদ মিনারের স্তম্ভে যে চোখের নকশা থাকার কথা ছিল তার পরিবর্তে সেখানে গলিয়ে দেওয়া হয় লোহার শিক। এই সঙ্গে বাদ পড়ে সূর্যের প্রতিফলন, ঝর্না, ঘড়ি, ভাস্কর্য ম্যুরাল ইত্যাদি। যা হোক, মূল পরিকল্পনার ছায়ায় সংক্ষিপ্ত আকারে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়। ১৯৬৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবসে শহীদ মিনারটি উদ্বোধন করেন শহীদ আবুল বরকতের মা হাসিনা বেগম। তখন তার বয়স ছিল বাহাত্তর বছর।

১৯৬৩ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ওই শহীদ মিনারই ছিল এ দেশের প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামের শপথ গ্রহণ কেন্দ্র এবং উৎসাহ উদ্দীপনার উৎস। এই শহীদ মিনার এ দেশের মানুষকে যুগিয়েছে কঠিন থেকে কঠিনতর সংগ্রামের প্রেরণা। এই শহীদ মিনারেই ঘটেছে স্বাধিকার আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উত্তরণ। তাই ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরুর সময়

www.phulkuri.org.bd

পাকিস্তানি বাহিনীর সমস্ত রোষ-ক্ষোভ গিয়ে পড়ে ওই শহীদ মিনারের উপর। আবার তাদের বন্য আক্রমণের শিকার হয় শহীদ মিনার। ১৯৭১ সালের ২৬শে ও ২৭শে মার্চ ভারি গোলাবর্ষণ করে শহীদ মিনারের স্তম্ভগুলো গুঁড়িয়ে দেয় তারা। শহীদ মিনার ভেঙে সেখানে লিখে রাখে 'মসজিদ'এর পরিচয় বিজ্ঞপ্তি।

কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ শহীদ মিনারের এই পরিচয় মনে-প্রাণে গ্রহণ করে নি। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে ভগ্ন শহীদ মিনারেই তারা পালন করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রথম শহীদ দিবস।

এরপর আবার শহীদ মিনার নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। তবে শহীদ মিনারের পুরনো নকশা রাখা হয় অপরিবর্তিত। দ্রুততার সঙ্গে জোড়াতালি দিয়ে কাজ শেষ করা হয়। ১৯৭১ সালের ভগ্ন শহীদ মিনার ১৯৭৩ সালে আবার মাথা তুলে দাঁড়ায়। তবে পূর্ণাঙ্গরূপে নয়।

শিল্পী হামিদুর রাহমানের নকশা ও পরিকল্পনার পুরোপুরি বাস্তবায়ন এখনো হয় নি। গত শতকের আশির দশকে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের আমলে মিনারের প্রাঙ্গণ কিছুটা প্রশস্ত করা হয়েছে মাত্র। মূল শহীদ মিনার রয়ে গেছে আগের মতোই।

শিল্পী হামিদুর রাহমানের নকশা ও পরিকল্পনা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে শহীদ মিনারটি হয়তো অন্যরকম সুন্দর ও শিল্পমণ্ডিত হয়ে উঠত। কিন্তু সেই অদেখা শিল্প-সৌন্দর্য এখন আর আমাদের খুঁজতে ইচ্ছে হয় না। শহীদ মিনারের বর্তমান রূপটিই আমাদের মর্মে গাথা হয়ে গেছে। মা ও সন্তানের প্রতীক স্তম্ভ নিয়ে গড়ে ওঠা এই শহীদ মিনার এখন আমাদের চেতনায় নিয়েছে স্থায়ী আসন। এর কোনো বিকল্প রূপ এখন আমরা আর কল্পনাই করতে পারি না।

শহীদ মিনার প্রথমে নির্মাণ করা হয়েছিল ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির শহীদদের স্মৃতির মিনার হিসেবে। কিন্তু এখন শহীদ মিনার শুধু ২১শে ফেব্রুয়ারির শহীদদের স্মৃতির মিনার নয়; শহীদ মিনার এখন এ দেশের সব শহীদদের স্মৃতির মিনার। শহীদ মিনার ১৯৫২, ১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৬৯, ১৯৭০, ১৯৭১ সালের সংগ্রাম ও যুদ্ধের শত সহস্র, লক্ষ লক্ষ শহীদের প্রতীক। শহীদ মিনার হাজার বছরের বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য, বাংলা বর্ণমালার প্রতীক। শহীদ মিনার বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক। তাই বলে এ মিনার শুধু আমাদের অতীত ঐতিহ্য নয়, এ মিনার আমাদের ভবিষ্যৎ আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, সংগ্রামেরও চিরন্তন উৎস।

www.phulkuri.org.bd

শিল্পী-কবির হৃদয়-বীণায় একুশে

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির রক্তমাখা ঘটনা এ দেশের মানুষের চেতনায় তোলে গভীর আলোড়ন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের এই আলোড়নের প্রতিফলন ঘটে সাহিত্য-সংস্কৃতিতে। লেখক কবির কলমে, শিল্পীর কণ্ঠে, সুরকারের হৃদয়-বীণায় যেন ২১শে ফেব্রুয়ারি নিয়ে আসে অন্যরকম আবেগঘন কোমল মর্মস্পর্শী এক অনুভূতি। কবি সাহিত্যিক শিল্পীরা মেতে ওঠেন সৃষ্টির উল্লোসে। কেউ লেখেন কবিতা, কেউ লেখেন গান, কেউ বাঁধেন সুর, আবার কেউ বা লেখেন নাটক।

একুশের মর্মন্তুত ঘটনাটি ঘটে ঢাকায়, অথচ একুশের প্রমথ কবিতা রচিত হয় চট্টগ্রামে। কবিতাটির রচয়িতা চট্টগ্রাম সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক মাহবুব-উল আলম চৌধুরী। একুশের দিন সন্ধ্যায় কবিতাটি রচনা করেন তিনি। কবিতার শিরোনাম, 'কাঁদতে আসি নি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি।' এটি একটি দীর্ঘ কবিতা। এটি কেবল দ্রুত রচিতই হয় নি, দ্রুত প্রকাশিত ও প্রচারিতও হয়েছিল। ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় গুলিবর্ষণ ও ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে চট্টগ্রাম লালদিঘি ময়দানে ২২শে ফেব্রুয়ারি বিকেলে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। মাহবুব-উল আলম চৌধুরীর কবিতাটি ছাপিয়ে পুস্তিকাকারে ওই জনসভায় প্রচার করা হয় এবং জনসভায় আবৃত্তি করা হয়। কিন্তু সরকার কবিতাটি সঙ্গে সঙ্গে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে কবিতাটির ১৫ হাজার কপি বাজেয়াপ্ত করে। পরবর্তীকালে কবিতাটির নিম্নরূপ একটি সংস্করণ পাওয়া যায়।

কাঁদতে আসি নি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি
মাহবুব-উল আলম চৌধুরী

এখানে যারা প্রাণ দিয়েছে
রমনার ঊর্ধ্বমুখী কৃষ্ণচূড়ার তলায়
যেখানে আগুনের ফুলকির মতো
এখানে ওখানে জ্বলছে অসংখ্য রক্তের ছাপ
সেখানে আমি কাঁদতে আসি নি।
আজ আমি শোকে বিহ্বল নই
আজ আমি ক্রোধে উন্মত্ত নই
আজ আমি প্রতিজ্ঞায় অবিচল।

যে শিশু আর কোনোদিন তার
পিতার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ার
সুযোগ পাবে না
যে গৃহবধূ আর কোনোদিন তার

www.phulkuri.org.bd

স্বামীর প্রতীক্ষায় আঁচলে প্রদীপ
ঢেকে দুয়ারে আর দাঁড়িয়ে থাকবে না
যে জননী খোকা এসেছে বলে
উদ্দাম আনন্দে সন্তানকে আর
বুকে জড়িয়ে ধরতে পারবে না
যে তরুণ মাটির কোলে লুটিয়ে
পড়ার আগে বার বার একটি
প্রিয়তমার ছবি চোখে আনতে
চেষ্টা করেছিল
সে অসংখ্য ভাইবোনদের নামে
আমার হাজার বছরের ঐতিহ্যে লালিত
যে ভাষায় আমি মাকে সম্বোধনে অভ্যস্ত
সেই ভাষা ও স্বদেশের নামে
এখানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে
আমি তাদের ফাঁসি দাবি নিয়ে এসেছি,
যারা আমার অসংখ্য ভাইবোনকে
যারা আমার মাতৃভাষাকে নির্বাসন দিতে
চেয়েছে তাদের জন্য
আমি ফাঁসি দাবি করছি।
যাদের আদেশে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে তাদের জন্য
ফাঁসি দাবি করছি
যারা এই মৃতদেহের উপর দিয়ে
ক্ষমতার আসনে আরোহণ করেছে
সেই বিশ্বাসঘাতকদের জন্য।

আমি ওদের বিচার দেখতে চাই
খোলা ময়দানে সেই নির্দিষ্ট জয়গাতে
শাস্তিপ্রাপ্তদের গুলিবিদ্ধ অবস্থায়
আমার দেশের মানুষ দেখতে চায়।
পাকিস্তানের প্রথম শহীদ
সেই চল্লিশটি রত্ন
দেশের চল্লিশজনের সেরা ছেলে
মা, বাবা, বৌ আর ছেলে নিয়ে
এই পৃথিবীর কোলে এক একটি
সংসার গড়ে তোলা যাদের
স্বপ্ন ছিল।

.....www.phulkuri.org.bd

যাদের স্বপ্ন ছিল আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে
আরো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করার
যাদের স্বপ্ন ছিল আণবিক শক্তিকে
কীভাবে মানুষের কাজে লাগানো যায়
শান্তির কাজে লাগানো যায়
তার সাধনা করার।
যাদের স্বপ্ন ছিল—রবীন্দ্রনাথের
'বাঁশীওয়ালার' চেয়েও সুন্দর
একটি কবিতা রচনা করার।
সেইসব শহীদ ভাইয়েরা আমার
যেখানে তোমরা প্রাণ দিয়েছ
সেখানে হাজার বছর পরেও
নির্বিচারে হত্যা করেছে
ওরা চল্লিশজন কিংবা আরো বেশি
যারা প্রাণ দিয়েছে ওখানে রমনার রৌদ্রদগ্ধ
কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায়
ভাষার জন্য, মাতৃভাষার জন্য বাংলার জন্য
যারা প্রাণ দিয়েছে ওখানে
একটি দেশের মহান সংস্কৃতির মর্যাদার জন্য
আলাওলের ঐতিহ্য
রবীন্দ্রনাথ, কায়কোবাদ, নজরুলের
সাহিত্য ও কবিতার জন্য।
যারা প্রাণ দিয়েছে
ভাটিয়ালি, বাউল, কীর্তন, গজল
নজরুলের "খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি
আমার দেশের মাটি"
এই দুইটি লাইনের জন্য।

রমনার মাঠের সেই মাটিতে
কৃষ্ণচূড়ার অসংখ্য ঝরা পাপড়ির মতো
চল্লিশটি তাজা প্রাণ আর
অঙ্কুরিত বীজের খোসার মধ্যে
আমি দেখতে পাচ্ছি তাদের অসংখ্য বুকের রক্ত
রামের, আবদুস সালামের কচি বুকের রক্ত
বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে সেরা কোনো
ছেলের বুকের রক্ত।

.....www.boiRboi.org.bd

আমি দেখতে পাচ্ছি তাদের প্রতিটি রক্তকণা
রমনার সবুজ ঘাসের উপর
আগুনের মতো জ্বলছে, জ্বলছে আর জ্বলছে
এক একটি হীরের টুকরোর মতো
বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছেলে চল্লিশটি রত্ন
বেঁচে থাকলে যারা হত
পাকিস্তানের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ
যাদের মধ্যে লিংকন, রঁল্যা
আরাগঁ, আইনস্টাইন আশ্রয় পেয়েছিল
যাদের মধ্যে আশ্রয় পেয়েছিল
শতাব্দীর সভ্যতার
সবচেয়ে প্রগতিশীল কয়েকটি মতবাদ
সেই চল্লিশটি রত্ন যেখানে প্রাণ দিয়েছে
আমরা সেখানে কাঁদতে আসি নি।

যারা গুলি ভরতি রইফেল নিয়ে এসেছিল ওখানে
যারা এসেছিল নির্দয়ভাবে হত্যা করার আদেশ নিয়ে
আমরা তাদের কাছে
ভাষার জন্য আবেদন জানাতেও আসি নি আজ
আমরা এসেছি খুনী জালিমের ফাঁসির দাবি নিয়ে
আমরা জানি তাদের হত্যা করা হয়েছে
নির্দয়ভাবে তাদের গুলি করা হয়েছে
ওদের কারো নাম তোমারই মতো 'ওসমান'
কারো বাবা তোমারই বাবার মতো
হয়তো কেরানি, কিংবা পূর্ব বাংলার
নিভৃত কোনো গাঁয়ে কারো বাবা
মাটির বুক থেকে সোনা ফলায়
হয়তো কারো বাবা কোনো
সরকারি চাকুরে।
তোমারই আমারই মতো
যারা হয়তো আজকে বেঁচে থাকতে পারত
আমারই মতো তাদের কোনো একজনের
হয়তো বিদায় দিন পর্যন্ত ধার্য হয়েছিল
তোমারই মতো তাদের কোনো একজনের হয়তো
মায়ের সদ্যপ্রাপ্ত চিঠিখানা এসে পড়বার আশায়
টেবিলে রেখে মিছিলে যোগ দিতে গিয়েছিল

এমন এক একটি মূর্তিমান স্বপ্নকে বুকে চেপে
জালিমের গুলিতে যারা প্রাণ দিল
সেইসব মৃত্যুর নামে
আমি ফাঁসির দাবি করছি
সেই মাটি থেকে তোমাদের রক্তাক্ত চিহ্ন
মুছে দিতে পারবে না সভ্যতার কোনো পদক্ষেপ
যদিও অসংখ্য মিছিল অস্পষ্ট নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করবে একদিন
তবুও বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ঘণ্টা ধ্বনি
প্রতিদিন তোমাদের ঐতিহাসিক মৃত্যুক্ষণ
ঘোষণা করবে
যদিও আগামীতে কোনো ঝড়ঝঞ্ঝা বিশ্বদ্যিালয়ের
ভিত্তি পর্যন্ত নড়িয়ে দিতে পারে
তবুও তোমাদের শহীদ নামের ঔজ্জ্বল্য
কিছুতেই মুছে যাবে না।
খুনী জালিমের নিপীড়নকারীর কঠিন হাত
কোনোদিনও চেপে দিতে পারবে না
তোমাদের সেই লক্ষ দিনের আশাকে
যেদিন আমরা লড়াই করে জিতে নেব
ন্যায়নীতির দিন
হে আমার মৃত ভাইয়েরা
সেই নিস্তব্ধতার মধ্য থেকে
তোমাদের কণ্ঠস্বর
স্বাধীনতার বলিষ্ঠ চিৎকার
ভেসে আসবে
সেই দিন আমাদের দেশের জনতা
খুনী জালিমকে ফাঁসির কাষ্ঠে
ঝুলাবেই ঝুলাবে
তোমাদের আশা অগ্নিশিখার মতো জ্বলবে
প্রতিশোধ এবং বিজয়ের আনন্দে।

(একুশে ফেব্রুয়ারি রাত ৭টা, ১৯৫২)

একুশের ঘটনার প্রতিবাদে ক্ষোভ ও ক্রোধ ভরা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার শিল্পিতরূপ এ কবিতা। এটি কোমল কঠিন তেজোদ্দীপ্ত এক কবিতা। এর স্নিগ্ধ পেলব শব্দগুচ্ছ যেমন পাঠকদের বেদনাকুল করে, তেমনি এর তীক্ষ্ণ তীর্যক বক্তব্য পাঠকদের করে সোচ্চার। এ কবিতাই ২১শে ফেব্রুয়ারিকে নিয়ে সৃষ্টিশীল লেখালেখির দ্বার উন্মোচন করে।

www.phulkuri.org.bd

একুশের প্রথম গানটি রচনা করেন ভাষাসৈনিক গাজীউল হক। এ গানটিও রচিত হয় একুশের দিন সন্ধ্যায়। তবে এটি রচিত হয় ঢাকায়।

ভুলব না, ভুলব না, একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলব না
লাঠি, গুলি আর টিয়ার গ্যাস, মিলিটারি আর মিলিটারি
ভুলব না।
রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই—এ দাবিতে ধর্মঘট,
বরকত সালামের খুনে লাল ঢাকার রাজপথ
ভুলব না।
স্মৃতিসৌধ ডাকিয়াছে জেগেছে পাষাণে প্রাণ,
মোরা কি ভুলিতে পারি খুনে রাঙা রাজপথ
ভুলব না।

এটিই একুশের প্রথম গান, এ গানের সুর আরোপ করেন নিজামুল হক। একুশের গান হিসেবে প্রথম কয়েক বছর এ গানটিই প্রচলিত ছিল।

২১শে ফেব্রুয়ারির ঘটনার অল্প ক'দিন পর আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী লেখেন একখানি কবিতা। একুশের চেতনাকে চিরন্তন করার প্রয়াসে সেই কবিতাই পরিণত হয় গানে। সেই অসামান্য গান, যার সুরে এখন প্রতি বছর একুশে আসে, যার সুরে জেগে ওঠে ঘুমন্ত দেশবাসী, জেগে ওঠে শহীদ মিনার। এ গানটিই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় একুশে মানে জেগে ওঠা। একুশে মানে মাথা নত না করা। একুশের প্রভাতফেরিতে আমরা গাই .....

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু-গড়া এ ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি॥

জাগো নাগিনীরা জাগো নাগিনীরা জাগো কালবোশেখীরা
শিশুহত্যার বিক্ষোভে আজ কাঁপুক বসুন্ধরা,
দেশের সোনার ছেলে খুন করে রোখে মানুষের দাবি
দিন বদলের ক্লান্তি লগনে তবু তোরা পার পাবি?
না, না, না, না খুন রাঙা ইতিহাসে শেষ রায় দেওয়া তারই
একুশে ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারি॥

সেদিনও এমনি নীল গগনের বসনে শীতের শেষে
রাত জাগা চাঁদ চুমো খেয়েছিল হেসে;

পথে পথে ফোটে রজনীগন্ধা অলকানন্দা যেন,
এমন সময় ঝড় এলো এক, ঝড় এলো ক্ষ্যাপা বুনো॥

সেই আঁধারে পশুদের মুখ চেনা
তাহাদের তরে মায়ের, বোনের, ভায়ের চরম ঘৃণা
ওরা গুলি ছোঁড়ে এদেশের প্রাণে দেশের দাবিকে রোখে
ওদের ঘৃণা পদাঘাত এই বাংলার বুকে
ওরা এ দেশের নয়,
দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়
ওরা মানুষের অন্ন, বস্ত্র, শান্তি নিয়েছে কাড়ি
একুশে ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারীরি॥

তুমি আজ জাগো তুমি আজ জাগো একুশে ফেব্রুয়ারি
আজো জালিমের কারাগারে মরে বীর ছেলে বীর নারী
আমার শহীদ ভাইয়ের আত্মা ডাকে
জাগে মানুষের সুপ্ত শক্তি হাটে মাঠে ঘাটে বাঁকে
দারুণ ক্রোধের আগুনে জ্বালবো ফেব্রুয়ারি
একুশে ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারি॥

এমন অলৌকিক বাণীমাধুরী আর কোন গানে আছে? এমন মায়াবী করুণ মর্মস্পর্শী সুর কয়টি গানের হয়? গানটির এই সুর দিয়েছিলেন আলতাফ মাহমুদ। তার আগে গানটির প্রথম সুর আরোপ করেছিলেন আবদুল লতিফ। ১৯৫৫ সালের দিকে এ গানটিই হয়ে ওঠে একুশের প্রভাতফেরির গান। তখন নতুন করে এ গানের সুর আরোপ করেন আলতাফ মাহমুদ। আলতাফ মাহমুদের সুরেই এখন গানটি গাই আমরা।

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী যখন এ গানটি লেখেন, তখন তিনি ঢাকা কলেজে ইন্টারমিডিয়েট সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্র। এই গান লেখার অপরাধে আরো ৯ জন ছাত্রের সঙ্গে তাকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। তখনকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চাপে সরকার সেই বহিষ্কারাদেশ তুলে নিতে বাধ্য হয়।

একুশে ফেব্রুয়ারির শহীদদের নাম কবিতায় প্রথম উচ্চারণ করেন হাসান হাফিজুর রহমান।

"আবুল বরকত নেই; সেই অস্বাভাবিক বেড়ে ওঠা
বিশাল শরীর বালক, মধুর স্টলের ছাদ ছুঁয়ে হাঁটত যে
তাঁকে ডেকো না;
সালাম, রফিকউদ্দিন, জব্বার—কি বিষণ্ন থোকা থোকা নাম
এই এক সারি নাম বর্শার তীক্ষ্ণ ফলার মতো এখন হৃদয়কে হানে;"

(সংক্ষেপিত)

www.phulkuri.org.bd

গভীর বেদনা ও পরম মমতা দিয়ে একুশে ফেব্রুয়ারির শহীদদের নামগুলো কবিতায় তুলে এনেছেন কবি। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এক ধরনের শীতল কিন্তু তীক্ষ্ণ অনুভূতি আমাদের আচ্ছন্ন করে। একুশে ফেব্রুয়ারির যারা নায়ক, তারা বিদায় নিয়ে গেছে পৃথিবী থেকে। কিন্তু তাদের নাম কালের ঢেউয়ে মুছে না গিয়ে কী করে চিরন্তন হয়ে উঠল, কী করে তারা একটি জনগোষ্ঠীর স্বদেশ নতুন করে সৃষ্টি করল, সেই অনুভূতিই অনুরণিত হয়েছে কবিতাটির শব্দে শব্দে।

একুশের প্রথম বছরের মধ্যে যেসব গান কবিতা রচিত হয়েছিল, সেসব আবেগময় রচনা নিচয় 'একুশে ফেব্রুয়ারী' নামে একটি সঙ্কলনে গ্রথিত করেছিলেন হাসান হাফিজুর রহমান। অত্যন্ত সমৃদ্ধ সঙ্কলন হয়েছিল সেটি। প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি। এর প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন শিল্পী আমিনুল ইসলাম। কিন্তু সরকারের রক্ত চক্ষুর কারণে সঙ্কলনটি ব্যাপক প্রচার পায় নি। অচিরেই এটি অর্জন করে নিষিদ্ধ হওয়ার গৌরব।

একুশের প্রথম নাটক 'কবর' রচনা করেন মুনীর চৌধুরী। ১৯৫৩ সালের ১৭ই জানুয়ারি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি অবস্থায় নাটকটি রচনা করেন তিনি। ১৯৫৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস পালন উপলক্ষে সহবন্দিদের অনুরোধে তিনি নাটকটি রচনা করতে উদ্বুদ্ধ হন। কারাগারে রাজবন্দিরা মঞ্চস্থও করেন নাটকটি।

২১শে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে জহির রায়হান লিখেছিলেন একটি উপন্যাস। নাম 'আরেক ফাল্গুন।' সম্ভবত এটিই একুশে ভিত্তিক প্রথম উপন্যাস।

মুক্তিযুদ্ধের আগে একমাত্র ২১শে ফেব্রুয়ারিই গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি কর্মীদের। তারা সেই আলোড়নের প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন তাদের নতুন নতুন সৃজনকর্মে। ২১শে ফেব্রুয়ারি বিষয়ে আমাদের যত সাহিত্য-কর্ম সৃষ্টি হয়েছে, একমাত্র মুক্তিযুদ্ধ ছাড়া আর কোনো একক বিষয় নিয়ে তা হয় নি। ২১শে ফেব্রুয়ারি আমাদের শিল্প-সাহিত্যে একটি নব দিগন্তের উন্মোচন ও নতুন মাত্রার সংযোজন।

www.phulkuri.org.bd

একুশের স্বপ্ন বাংলা একাডেমী ও একুশে গ্রন্থমেলা

আমাদের জাতীয় জীবনে ২১শে ফেব্রুয়ারির গুরত্ব ও প্রভাব অপরিসীম। আমাদের অনেক সৃষ্টির মূলে কাজ করেছে ২১শে ফেব্রুয়ারি। ২১শে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে যেমন বিপুল সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে গভীর ও উন্নততর গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটির নাম? বাংলা একাডেমী। একুশের চেতনাকে সজীব ও সমুজ্জ্বল রাখার প্রয়াসে আবার এই বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণেই শুরু হয়েছে অমর একুশে গ্রন্থমেলা। এখন আমরা বাংলা একাডেমী এবং একুশে গ্রন্থমেলা সম্পর্কে একটু জেনে নেওয়ার চেষ্টা করতে পারি।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি থেকে সৃষ্টি হয়েছিল ঐতিহাসিক একুশ দফার। একুশ দফা ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি। একুশ দফার উল্লেখযোগ্য দফাগুলো ছিল শহীদ মিনার নির্মাণ, একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ঘোষণা, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা, পূর্ব বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীনের সরকারি বাসভবন বর্ধমান হাউস'-এ বাংলা একাডেমী স্থাপন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনকে সামনে রেখে ঘোষিত হয় এই একুশ দফা। অবশ্য বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠার দাবি ওঠে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির পরপরই। ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার নির্দশন স্বরূপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্ট (তদানীন্তন সিণ্ডিকেট) বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু নানা কারণে সেই সময় এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় নি। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের অন্যতম অঙ্গীকার ছিল 'বর্ধমান হাউস'-এ বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু বর্ধমান হাউসেই বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠার দাবি ওঠে কেন?

আমরা জানি বর্ধমান ছিল তৎকালীন পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন। এই ভবনেই ১৯৪৮ সালে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ও আমাদের ভাষা-যোদ্ধাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় একটি চুক্তি, যা শাসকগোষ্ঠী কিছুদিন পরই ভঙ্গ করে। এই ভবনে বসেই গ্রহণ করা হত বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে যাতবতীয় পরিকল্পনা, এবং এই ভবন থেকেই পরিচালিত হত বাংলা ভাষী ছাত্র-জনতাকে দমন-পীড়নের হীন কূটকৌশল। এর ফলে শাসকগোষ্ঠীর দর্প চূর্ণ করার জন্যই ছাত্র-জনতার পক্ষ থেকে বর্ধমান হাউসে বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠার দাবি ওঠে। এই দাবি বাস্তব রূপ লাভ করে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের পর।

১৯৫৫ সালের ২৬শে নভেম্বর পূর্ব বাংলা সরকার বাংলা একাডেমীর 'প্রিপারেটরি কমিটি' গঠনের একটি আদেশ জারি করে। এর মধ্য দিয়েই বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর। ১৯৫৭ সালের ৩রা এপ্রিল পূর্ব পাকস্তান আইন পরিষদে 'দ্য বেঙ্গলি একাডেমী অ্যাক্ট ১৯৫৭' গৃহীত হলে এটি একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করে।

জাতির মননের প্রতীক বাংলা একাডেমী

অনেক রদবদলের ভেতর দিয়ে বাংলা একাডেমী এখন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা, গবেষণা, প্রচার ও প্রসারের জন্য বাংলাদেশের এক জাতীয় প্রতিষ্ঠান। বাংলা একাডেমীকে বলা হয় জাতির মননের প্রতীক। বাংলাদেশের চিন্তার ফসলকে লালন করে বাংলা একাডেমী। বাংলাদেশের মানুষের সংস্কৃতি ও চেতনাকে শাণিত করাই এর লক্ষ্য।

বাংলা ভাষায় উচ্চশিক্ষা স্তরের পাঠ্যপুস্তক, প্রয়াত লেখকদের জীবনী ও রচনাবলি প্রকাশ, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে গবেষণা বৃত্তি প্রদান, লোকসাহিত্য চর্চা, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মীদের প্রশিক্ষণ দান, বিভিন্ন বিষয়ে অভিধান প্রণয়ন ও প্রকাশ, বিদেশী ভাষায় রচিত গ্রন্থ বাংলায় এবং বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থ ইংরেজিতে অনুবাদ করে প্রকাশ করা বাংলা একাডেমীর উল্লেখযোগ্য কাজ। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ অবদানের জন্য প্রতি বছর একাধিক সাহিত্যিককে পুরস্কার ও স্বীকৃতি প্রদান বাংলা একাডেমীর কার্যক্রমের আওতাভুক্ত। বাংলা একাডেমী প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা ও সাহিত্য জগতের মনীষীব্যক্তিত্বের জীবন ও কর্ম বিষয়ে আলোচনা ও সেমিনার অনুষ্ঠান, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে।

তবে বাংলা একাডেমীর যাবতীয় কার্যক্রমের মধ্যে সবচেয়ে আড়ম্বরপূর্ণ কার্যক্রম হল একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপন উপলক্ষে মাসব্যাপী অমর একুশে গ্রন্থমেলার আয়োজন। এই মেলা আয়োজনের বিষয়ে বাংলা একাডেমীকে সহযোগিতা দিয়ে থাকে 'বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি' এবং 'বাংলাদেশ সৃজনশীল প্রকাশক পরিষদ'।

www.phulkuri.org.bd

সাধারণত প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে অমর একুশে গ্রন্থমেলা আয়োজন করা হয়। এই মেলা আকর্ষণীয় করে তোলা হয় নানা বিষয়ে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। অনুষ্ঠানমালা এমনভাবে সাজানো হয় যে, এই মেলায় আসলে যেন বাংলাদেশের হৃদয়কে জানা হয়ে যায়।

অমর একুশে গ্রন্থমেলার সময় অসংখ্য মানুষের পদচারণায় মুখরিত হয়ে ওঠে বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণ। মেলা তো নয়, যেন এক মহামিলন তীর্থ, যেন এক প্রাণোচ্ছল মহোৎসব। কেবল বইকে কেন্দ্র করে আয়োজিত একটি মেলায় এত মানুষের সমাগম রীতিমত এক বিস্ময়ের ব্যাপার।

বাংলাদেশে বইকে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে এই মেলার ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই মেলা একদিকে যেমন ব্যাপক পাঠক সৃষ্টি করেছে, অন্যদিকে বই প্রকাশনাকে উন্নীত করেছে শিল্পের পর্যায়ে। এর পাশাপাশি এই মেলা লেখক-শিল্পীকে দিয়ে যাচ্ছে নতুন সৃষ্টির প্রেরণা। এখন বাংলাদেশের লেখক-প্রকাশক-পাঠক সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে এই মেলার জন্য। এই মেলা লেখক-প্রকাশক ও পাঠকদের যোগসূত্র স্থাপনের এক অনন্য মাধ্যম। সারা বছর আমাদের দেশে যত সৃজনশীল বই প্রকাশিত হয় তার শতকরা ৭০ ভাগই প্রকাশিত হয় একুশে বইমেলায়। আমাদের প্রকাশনা শিল্পকে এই মেলা সুসংহত করেছে। বাংলা সাহিত্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে এই মেলা।

আজকের এই জমজমাট একুশে বইমেলা কিন্তু হঠাৎ করে এই পর্যায়ে আসে নি। বিন্দু বিন্দু জলে যেমন সিন্ধু গড়ে ওঠে, তেমনি একুশে বইমেলাও একটু একটু করে এসেছে আজকের পর্যায়ে। এর একটি উজ্জ্বল অতীত আছে।

১৯৫৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই প্রতিষ্ঠানটি বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়ন ও বিকাশে নিবেদিত ছিল। স্বাধীনতার আগেই এই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয় অসংখ্য সমৃদ্ধ বাংলা গ্রন্থ। কিন্তু নানা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিকূলতার কারণে সেসব বইয়ের সুষ্ঠু বিপন্ন ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি।

স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলা একাডেমী নতুন চেতনায় নতুন উদ্যমে যাত্রা শুরু করে। ১৯৭২ সালে অমর একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপিত হয় ভিন্নমাত্রায় বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম শহীদ দিবস পালনের জন্য বাংলা একাডেমী আয়োজন করে সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানমালা। অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিল আলোচনা, প্রবন্ধ পাঠ, আবৃত্তি, স্মৃতিচারণ, প্রদর্শনী, গণসঙ্গীত ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সপ্তাহব্যাপী এসব অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বাংলা একাডেমী নিজেদের প্রকাশিত বই বিশেষ কমিশনে বিক্রির ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এই বই বিক্রির মধ্য দিয়েই ঘটে একুশে বইমেলার সূত্রপাত।

১৯৭৪ সাল পর্যন্ত বাংলা একাডেমী হ্রাসকৃত মূল্যে বই বিক্রির ধারা চালু রাখে। এ সময় পাঠক সমাজে ব্যাপক সাড়া পড়ে। বই ক্রয়ে পাঠকদের আগ্রহ অনেক বেড়ে যায়। ক্রেতা-সাধারণকে আরো আকৃষ্ট করার জন্য বাংলা একাডেমী ১৯৭৪ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারি স্মরণে

www.phulkuri.org.bd

আয়োজন করে জাতীয় সাহিত্য সম্মেলন। এ সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের কবি-সাহিত্যিকদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়। সারা দেশের বিপুল সংখ্যক সাহিত্যানুরাগী মানুষ এই সম্মেলনে যোগ দেন। এ সময় বাংলা একাডেমী প্রকাশিত গ্রন্থের প্রদর্শনী ও বিক্রয় কার্যক্রম আরো ব্যাপকতা লাভ করে।

১৯৭৫ সাল থেকে অমর একুশেকে কেন্দ্র করে কয়েকটি বেসরকারি প্রকাশনা সংস্থাও উৎসাহী হয়ে ওঠে। এ সংস্থাগুলোর মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য নামটি হল 'মুক্তধারা'। ১৯৭৬ সালে মুক্তধারার সঙ্গে যোগ দেয় খান ব্রাদার্স, আহমদ পাবলিশিং-সহ আরো কয়েকটি বেসরকারি প্রকাশনা সংস্থা। এসব প্রকাশনা সংস্থা বাংলা একাডেমীর গেটের পাশে খোলা আকাশের নিচে বসে বই বিক্রি শুরু করে।

অমর একুশের অনুষ্ঠানমালাকে কেন্দ্র করে বেসরকারি প্রকাশনা-সংস্থাগুলোর বই বিক্রির আগ্রহ দেখে ১৯৭৭ সালে বাংলা একাডেমীর তৎকালীন মহাপরিচালক ড. আশরাফ সিদ্দিকী বইমেলা আয়োজনের চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে বইমেলা আয়োজনের বিষয়ে তিনি বেসরকারি প্রকাশনা সংস্থাগুলোর সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

১৯৭৮ সালে বাংলা একাডেমীর একুশের অনুষ্ঠানমালাকে ঘিরে বই বিপণনকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আরো বেড়ে যায়। এতে একটি পূর্ণাঙ্গ মেলায় রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ১৯৭৮ সালেই একুশের অনুষ্ঠানমালায় বই বিপণনের কার্যক্রমকে আনুষ্ঠানিকভাবে বইমেলার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ১৯৭৯ সালে বইমেলা আয়োজনের জন্য বাংলা একাডেমীর সঙ্গে সহযোগী শক্তি হিসেবে 'বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি' এগিয়ে আসে। এ বছরই বইমেলা ব্যাপক পরিচিতি ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে।

বইমেলার আয়োজনকে সুশৃঙ্খল ও সুসংহত করার জন্য ১৯৮৪ সালে আনুষঙ্গিক নীতিমালা প্রণীত হয় এবং মেলার নামকরণ হয় 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'। এরপর থেকে প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপন উপলক্ষে নিয়মিত বইমেলা আয়োজন করা হচ্ছে। প্রতি বছরই বইমেলার স্টলের সংখ্যা ও লোক সমাগম বাড়তে থাকে। ১৯৯০ সালের পর শৌখিন ও নিতান্ত নাম সর্বস্ব প্রকাশকের সংখ্যা বেড়ে যায় অধিক মাত্রায়। বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণ ছাড়িয়ে মেলা ছড়িয়ে পড়ে সোহ্‌রাওয়ার্দি উদ্যান ঘেঁষা রাস্তার দু'পাশে। বইয়ের পাশাপাশি এ সময় অডিও ক্যাসেট, কুটির শিল্প সামগ্রী, রেডিমেড গার্মেন্টস ও খাবারের দোকান ইত্যাদির সমারোহ শুরু হয়। এসব রকমারি পণ্যের ক্রেতাদের ভিড়ে বইয়ের ক্রেতাদের রীতিমত পিষ্ট হওয়ার দশ দাঁড়ায়। এতে এই মেলার মূল উদ্দেশ্য ও স্বকীয়তা ব্যাহত হতে থাকে। ফলে বই মেলার নীতিমালা পুনর্বিন্যস্ত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৯৯৯ সাল থেকে মেলা কমিটি ও বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ স্টল বরাদ্দের ক্ষেত্রে কঠোর বিধি নিষেধ আরোপ করে। নতুন নীতিমালা অনুযায়ী একুশের গ্রন্থমেলায় পুস্তক প্রকাশন ও বিপণন সংস্থা ছাড়া অন্য প্রতিষ্ঠানকে স্টল বরাদ্দ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণেই মেলাকে সীমাবদ্ধ রাখা হয়।

এখন কেবল পুস্তক প্রকাশন ও বিপণন সংস্থাগুলোই মেলায় যোগ দেয়। তারপরও সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রতি বছরই এ মেলায় স্টলের সংখ্যা বাড়ছে। এখন প্রায় ৩০০-এর মতো

www.phulkuri.org.bd

প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে। ২০০৪ সালের একুশে গ্রনন্থমেলায় স্টলের ইউনিট সংখ্যা ছিল ৪৫৬ এবং অংশগ্রহণকারী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৩১২।

মেলার শুরু থেকে শেষ দিন পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নতুন নতুন বই। প্রতিদিনই তথ্যকেন্দ্র থেকে প্রচার করা হয় নতুন বইয়ের খবর। মেলার মাঝামাঝি একটি জায়গা বরাদ্দ করা হয় লেখকদের আড্ডার জন্য। এর নাম লেখককুঞ্জ। লেখককুঞ্জে লেখকদের আড্ডার পাশাপাশি চলে নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান ও ছড়া-কবিতা পাঠের আসর। এই ফাঁকে অটোগ্রাফ শিকারি পাঠকেরা খুঁজে নেন প্রিয় লেখকদের। লেখকেরা লেখককুঞ্জে যেমন বসেন, তেমনি আবার বসেন বিশেষ বিশেষ স্টলে। বিক্রিত বইয়ে অটোগ্রাফ দিয়ে তাঁরা মেটান অটোগ্রাফ শিকারি পাঠকদের তৃষ্ণা। পাঠকেরা দেখে ও পেয়ে আনন্দিত আর লেখকেরা দিতে পেরে খুশি। সবখানে প্রাণের ছোঁয়া, সবদিকে উৎসব মুখর পরিবেশ।

এ মেলার আকর্ষণের যেন কমতি নেই। মেলা চলাকালে প্রতি বছর ২০শে ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করা হয় বাংলা একাডেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিকের নাম। ২১শে ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠনিকভাবে পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিককে পুরস্কার প্রদান করা হয়। এই পুরস্কার প্রদানের আনুষ্ঠানিকতা মেলার আকর্ষণ আরো অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয়।

অমর একুশে গ্রন্থমেলা কেবল নিছক একটি মেলা নয়। এ মেলার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ২১শে ফেব্রুয়ারির চেতনা। এ মেলাকে বাদ দিয়ে এখন যেমন ২১শে ফেব্রুয়ারিকে কল্পনা করা যায় না, তেমনি মেলার কার্যক্রমকে বাদ দিয়ে বাংলা একাডেমীকেও ভাবা যায় না। অমর একুশে, বাংলা একাডেমী ও একুশে গ্রন্থমেলা যেন একই সূত্রে গাঁথা। ২১শে ফেব্রুয়ারি যদি আমাদের জাতীয় চেতনার অংশ হয়, তবে বাংলা একাডেমী ও একুশে গ্রন্থমেলা আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য। আসলে ২১শে ফেব্রুয়ারির স্বপ্নেরই রূপায়ণ আমাদের বাংলা একাডেমী ও একুশে গ্রন্থমেলা।

www.phulkuri.org.bd

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

আমাদের জীবনে বছরের সব দিন সমান গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে আসে না। বছরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দিন খুব বেশি হয় না। এই অল্প কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিনের মধ্যে কিছুদিন আমরা পালন করি বা স্মরণ করি কেবল পারিবারিকভাবে। যেমন—কারো জন্মদিন বা মৃত্যুবার্ষিকী। কিছুদিন পালন করি জাতীয়ভাবে। যেমন—স্বাধীনতা দিবস বা বিজয় দিবস বা জাতীয় যুব দিবস ইত্যাদি। আবার কিছু দিন আমরা পালন করি আন্তর্জাতিকভাবে অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী। যেমন—বিশ্ব শিশু দিবস, বিশ্ব বসতি দিবস, আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ইত্যাদি।

এসব বিশেষ বিশেষ দিবসে আমরা কী করি? যে বিষয়কে কেন্দ্র করে দিবসটি ঘোষণা করা হয়, আমরা সেই বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবনের চেষ্টা করি, বিষয়টিকে নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করি, বিষয়টির মর্মার্থ প্রচার করি, বিষয়টি সম্পর্কে অন্যদেরও সচেতন করে তুলি। এসব উদ্দেশ্য নিয়েই বিশেষ বিশেষ দিবস ঘোষণা করা হয় এবং বিশ্বব্যাপী উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে যথাযথভাবে তা পালন করা হয়।

১৯৯৯ সালের আগে পর্যন্ত বিশ্বে মাতৃভাষার জন্য কোনো বিশেষ দিবস নির্ধারণ করা ছিল না। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (ইউনেস্কো) মাতৃভাষার জন্য একটি বিশেষ দিবস ঘোষণা করে। দিবসটির নাম দেওয়া হয়—'আন্তজার্তিক মাতৃভাষা দিবস'। দিবসটি হল একুশে ফেব্রুয়ারি। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবিতে এ দেশের ছাত্র-জনতা ১৯৫২ সালের যে দিনে জীবন দান করেছেন, সেসব বীর শহীদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা স্বরূপ যে দিনটিকে ১৯৫২ সালের পর থেকে আমরা শহীদ দিবস হিসেবে পালন করে আসছিলাম ইউনেস্কো সেই দিনটিকেই ঘোষণা করে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এটি আমাদের জন্য এক বিরল সম্মান, অনন্য গৌরবদীপ্ত ঘটনা। আমাদের শহীদ দিবস এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এখন এ দিনটি কেবল আমাদের নয়, সারা বিশ্বের নানা ভাষার জনগোষ্ঠীর পালনীয়। বিশ্ববাসীর কাছেও এ দিনটি আজ সমানভাবে সমাদৃত। কিন্তু আমাদের একুশে ফেব্রয়ারি কীভাবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা পেল? আমাদের শহীদ দিবস কীভাবে পরিণত হল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে?

আমরা এবার সেসব কথাই জেনে নেওয়ার চেষ্টা করব।

একুশে ফেব্রুয়ারিকে ঘিরে বাংলাদেশের মানুষের আবেগের কোনো অন্ত নেই। সেই ১৯৫২ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি তারিখেই ২১শে ফেব্রুয়ারির শহীদদের স্মৃতি অম্লান করে রাখার মানসে এ দেশের মানুষ নির্মাণ করেছে শহীদ মিনার। এরপর থেকে ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে প্রতি বছর এ দিনটিকে পালন করা হচ্ছে শহীদ দিবস হিসেবে। এ দিন দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সর্বস্তরের জনগণ শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানায়।

এ দিনটির চেতনায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য এ দেশে গড়ে তোলা হয়েছে বাংলা একাডেমী নামে একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান। এই বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে ফেব্রুয়ারি মাসব্যাপী আয়োজন করা হয় অমর একুশে গ্রন্থমেলা। সারা বছর বাংলাদেশে প্রকাশিত বইয়ের শতকরা ৭০ ভাগ বই এখন একুশে গ্রন্থমেলায় প্রকাশিত হয়। শুধু নতুন নতুন বই প্রকাশ নয়, একুশের বইমেলাকে কেন্দ্র করে বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে আয়োজন করা হয় নানা আকর্ষণীয় আলোচনা অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। একুশে ফেব্রুয়ারিকে সামানে রেখেই ঘোষণা করা হয় বাংলা একাডেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিকের নাম এবং একুশের দিনেই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করা হয় এই পুরস্কার। এ দিন বাংলাদেশে সরকারি ছুটি থাকে। এভাবে অমর একুশে হয়ে উঠেছে আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের অংশ।

একুশে ফেব্রুয়ারির উন্মাদনা কেবল ঢাকা শহরে সীমাবদ্ধ নয়। সারা দেশে একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপিত হয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে। ঢাকার বাইরের স্কুল-কলেজগুলোর ছাত্রছাত্রীরাও নগ্নপায়ে প্রভাতফেরি করে শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানায়। স্কুল-কলেজ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আয়োজন করা হয় নানা অনুষ্ঠানের। অমর একুশের তাৎপর্য নিয়ে প্রদান করা হয় বক্তৃতা বিবৃতি। মাতৃভাষার উন্নয়ন ও শহীদদের স্মরণে ওঠে নানা দাবি, প্রস্তাব। এমনি একটি দাবি ওঠে ১৯৯৭ সালের শহীদ দিবসে ভাষা আন্দোলনের শহীদ আবদুল জব্বারের জন্মস্থান ময়মনসিংহের গফরগাঁও-এ। গফরগাঁও-এর নাট্য সংগঠন 'গফরগাঁও থিয়েটার' একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মর্যাদা দেওয়ার দাবি তোলে। কিন্তু এ দাবির পক্ষে জাতীয় পর্যায়ে তেমন কোনো সাড়া-সমর্থন পাওয়া যায় নি। স্বাভাবিক কারণেই এঁদো পুকুরের একটি ছোট্ট ঢেউয়ের মতো সে দাবি নিভৃতেই মিলিয়ে যায়। অবশ্য এরও বেশ আগে ১৯৯২ সালে বাংলাদেশের বাইরে ভারতের বাংলাভাষী রাজ্য ত্রিপুরায় সরকারিভাবে একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'বাংলা ভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে'ও দীর্ঘদিন ধরে একুশে ফেব্রুয়ারি বেসরকারিভাবে উদযাপিত হয়ে আসছিল। কিন্তু এসব উদ্যোগ-আয়োজনের তেমন বিস্তৃতি ও জোরালো ভিত্তি ছিল না।

একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা দেওয়ার বিষয়ে প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন কানাডায় বসবাসকারী কয়েক জন বাংলাদেশী। তাদের মধ্যে কানাডার ভ্যাঙ্কুবারের রফিকুল ইসলামের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার মনেই প্রথম ধারণা জন্মে যে, আমাদের শহীদ দিবস একুশে ফেব্রুয়ারিই হতে পারে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। কেননা পৃথিবীর আর কোনো দেশে কোনো ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন উৎসর্গ করার ঘটনা কোনোদিন ঘটে নি; যেমনটি ঘটেছে একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা বাংলা ভাষার জন্য। সুতরাং একমাত্র এ দিনটিই হতে পারে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। রফিকুল ইসলাম এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অন্যান্য ভাষার উৎসাহী কয়েক জন মানুষ নিয়ে কানাডায় একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। সংগঠনটির নাম 'মাদার ল্যাংগুয়েজ মুভমেন্ট।'

১৯৯৮ সালের ৮ই জানুয়ারি রফিকুল ইসলাম 'মাদার ল্যাংগুয়েজ মুভমেন্ট' এর মাধ্যমে জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের কাছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার বিষয়ে প্রথম

আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক এবং স্বপ্ন ও সংগ্রামের চিরন্তন উৎস শহীদ মিনার

আবেদন জানান। আবেদনে তিনি সরাসরি একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার প্রস্তাব পেশ করেন এবং এর যৌক্তিতা তুলে ধরেন। কিন্তু জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান 'মাদার ল্যাংগুয়েজ মুভমেন্ট'কে বিষয়টি 'ইউনেস্কো'-এর নিকট উত্থাপনের পরামর্শ দেন। কেননা এটি ছিল ইউনেস্কোর আওতাধীন বিষয়। ইউনেস্কোর কাজ হচ্ছে জাতিতে জাতিতে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করে বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা।

১৯৯৮ সালের ২৯শে মার্চ সাত জাতি ও সাত ভাষার দশ জন ব্যক্তির স্বাক্ষর সংবলিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার একটি আবেদন প্যারিসের ইউনেস্কো সদর দপ্তরে পাঠানো হয়। সাত জাতি ও সাত ভাষার যে দশ জন ব্যক্তি আবেদনে স্বাক্ষর করেছিলেন তারা হলেন : আলবার্ট ভিনজন (ফিলিপিনো), কারমেন ক্রিস্টোবাল (ফিলিপিনো), জ্যাসন মেরিন (ইংরেজি), সুসান হভগিন্স (ইংরেজি), ড. কেলভিন চাও (ক্যান্তনিজ), নাজনীন ইসলাম (কা-সি), রেনাটে মার্টিন্স (জার্মান), করুণা জোসি (হিন্দি), রফিকুল ইসলাম (বাংলা) এবং আবদুস সালাম (বাংলা)। ইউনেস্কো সদর দপ্তরে যোগাযোগের ক্ষেত্রে জাতিসংঘে কর্মরত বাঙালি কর্মকর্তা হাসান ফেরদৌস বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

এর মধ্যে এক বছর কেটে যায়। আশাবাদী রফিকুল ইসলাম ও তার সহযোগী আবদুস সালাম কিন্তু হতোদ্যম হন নি, তারা হতাশায় ভেঙে পড়েন নি। রফিকুল ইসলাম ইউনেস্কো সদর দপ্তরে টেলিফোনে বার্তা পাঠান। জবাবে ইউনেস্কোর শিক্ষা বিষয়ক প্রকল্প বিশেষজ্ঞ মিসেস আনা মারিয়া ১৯৯৯ সালের ৮ই এপ্রিল কানাডায় রফিকুল ইসলামকে একটি চিঠি দেন। চিঠিতে তিনি রফিকুল ইসলামকে তার প্রস্তাবের পক্ষে আরো কিছু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। মিসেস আনা মারিয়ার চিঠির তথ্যগুলো হল :

১. প্রস্তাবটি গ্রহণ করার জন্য জাতিসংঘের একটি সাধারণ অধিবেশন ডাকতে হবে। এ বছরের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ৩০তম অধিবেশন বসতে পারে।

২. যে কোনো একটি দেশের পক্ষ থেকে প্রস্তাবটি উপস্থাপন করতে হবে। কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অনুরোধে কোনো রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

৩. 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ঘোষণার জন্য ইউনেস্কোর ন্যাশনাল কমিশনের সদস্যভুক্ত দেশসমূহ, যেমন—বাংলাদেশ, কানাডা, ফিনল্যাণ্ড, ভারত ও হাঙ্গেরিকে প্রস্তাবক হতে হবে।

মিসেস আনা মারিয়া ব্যক্তিগতভাবে এ বিষয়ে খুব আগ্রহী ছিলেন। তাই তিনি রফিকুল ইসলামকে ইউনেস্কো পরিচালনা পরিষদের কয়েকটি সদস্য দেশের ঠিকানাও জানিয়ে দেন।

মিসেস আনা মারিয়ার চিঠি পেয়ে রফিকুল ইসলাম উল্লিখিত পাঁচটি দেশের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন। ১৯৯৯ সালের মে থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত তিনি দেশগুলোর উচ্চ পর্যায়ে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে যান। তার জোরালো যোগাযোগের ফলে ১৯৯৯ সালের ১৬ই আগস্ট প্রথম হাঙ্গেরি থেকে সাড়া পাওয়া যায়। হাঙ্গেরি প্রথম 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ঘোষণার একটি প্রস্তাব জাতিসংঘের ইউনেস্কোকে পাঠায়। এ তথ্য হাঙ্গেরি থেকে পত্রযোগে রফিকুল ইসলামকে জানানো হয়।

ফিনল্যাণ্ড রফিকুল ইসলামকে জানায় যে, অন্য কোনো দেশ প্রস্তাবটি উত্থাপন করলে তা সমর্থন করতে ফিনল্যাণ্ড সম্মত আছে।

বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেন এবং দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেন।

বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ১৯৯৯ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর সরাসরি ইউনেস্কো সদর দপ্তরে প্রস্তাবটি পেশ করা হয়। প্রস্তাবটি স্বাক্ষর করেন 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল কমিশন ফর ইউনেস্কো'-এর সচিব প্রফেসর কফিলউদ্দিন আহমদ। ১৭ লাইনের মূল প্রস্তাবের সঙ্গে ছিল ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করার পক্ষে যৌক্তিকতার একটি স্তবক। মূল প্রস্তাবের শেষ লাইনে লেখা হয়—

"Bangladesh proposes that 21st February be proclaimed International Mother Language Day throughout the world to commemorate the martyers who sacrificed their lives on this very date in 1952."

(বাংলাদেশ প্রস্তাব করছে যে, ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি যারা জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ দিনটিকে সারা পৃথিবীর জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করা হোক।)

প্রস্তাব প্রেরণের পাশাপাশি তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীকে (এ. এস. এইচ. কে. সাদেক, এম. পি.) দলনেতা করে একটি প্রতিনিধি দলও প্যারিসে প্রেরণ করা হয়।

১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কোর ৩০তম সাধারণ অধিবেশনে প্রস্তাবটি উত্থাপিত হয়। প্রস্তাবের সূচনায় বলা হয়—"সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে ভাষা হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। পৃথিবীতে প্রায় ৫০০০ মাতৃভাষা আছে। মাতৃভাষার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও মর্যাদা দানের জন্য একটি দিবস থাকা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে কোনো একটি দিনকে চিহ্নিত করা হলে তা বিশ্বে প্রচলিত বিভিন্ন মাতৃভাষা প্রচারের ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে, মাতৃভাষার প্রচলন কেবল ভাষার বৈচিত্র্য ও বহুভাষাভিত্তিক শিক্ষাকেই উৎসাহিত করবে না, তা ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উন্নয়ন ও অনুধাবনের ক্ষেত্রেও অবদান রাখবে। পারস্পরিক বোঝাপড়া, সহনশীলতা ও সংলাপের উপর ভিত্তি করে বিশ্ব-সংহতি আরো জোরদার হবে।"

প্রস্তাবে আরো বলা হয়, "১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে মাতৃভাষার জন্য অভূতপূর্ব আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ এবং সেদিন যারা প্রাণ উৎসর্গ করেছেন তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার প্রস্তাব করা হচ্ছে।"

মূল অধিবেশনে প্রস্তাবক হিসেবে বাংলাদেশের সঙ্গে সৌদি আরবের নামও যুক্ত হয়। পাকিস্তানসহ মোট ২৭টি দেশ আগেই এ প্রস্তাব সমর্থন করার বিষয় নিশ্চিত করে। দেশগুলো হচ্ছে : আইভরি কোস্ট, ইতালি, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, ওমান, কমোরো দ্বীপপুঞ্জ, গাম্বিয়া, ডোমিনিকান রিপাবলিক, পাকিস্তান, পাপুয়া নিউগিনি, প্যারাগুয়ে, ফিলিপাইন, বাহামা, বেনিন,

বেলারুশ, ভানুয়াতু, ভারত, মাইক্রোনেশিয়ান ফেডারেশন, মালয়েশিয়া, মিশর, রাশিয়া, লিথুয়ানিয়া, শ্রীলঙ্কা, শ্লোভাকিয়া, সিরিয়া, সৌদি আরব ও হণ্ডুরাস।

১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর জেনারেল কনফারেন্স ফর ডিসিপ্লিনারি সেশনে প্রস্তাবটি ১৮৮ ভোটে সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়। এর ফলে আমাদের 'শহীদ দিবস পরিণত হয় 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'-এ ২০০০ সাল থেকে বিশ্বের ১৮৮টি দেশে একুশে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। প্রতি বছরই দেশের সংখ্যা বাড়ছে। এখন ১৯১টি দেশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়।

আমাদের ভাষা আন্দোলনের মহান দিন একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার মধ্য দিয়ে বিশ্বের সকল ক্ষুদ্র জাতি ও ভাষার জনগোষ্ঠীকে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। এতে পৃথিবীর বৃহৎ ও সমৃদ্ধ ভাষাগুলোর পাশাপাশি ক্ষুদ্র, নিপীড়িত ও অবহেলিত ভাষাগুলোও বেঁচে থাকার অধিকার পেয়েছে, লাভ করেছে বিকশিত হবার সুযোগ। এসব ক্ষুদ্র নিপীড়িত ও অবহেলিত ভাষার মানুষেরাও আজ বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখতে পারে। আমাদের ভাষা আন্দোলনই বিশ্বের সকল মানুষকে এনে দিয়েছে মাতৃভাষা লালনের সুযোগ, স্বপ্ন ও অধিকার। এই একটি ক্ষেত্রে বিশ্বে আজ আমরা অগ্রপথিক জাতি। এ নিশ্চয়ই আমাদের জন্য এক দুর্লভ সম্মান ও অনন্য গৌরবের বিষয়।

আমরা এ দিনটির জন্য গর্ব অনুভব করি।

www.phulkuri.org.bd

ভালোবাসি মাতৃভাষা

জীব জগতের মধ্যে অন্যদের সঙ্গে মানুষের বড় পার্থক্য হল, মানুষের কম্পনাশক্তি আছে। সে কথা বলতে পারে। অন্যরা পারে না। তবে অন্যরা হয়তো নানা রকম শব্দ করে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু তাদের কোনো নির্দিষ্ট ভাষা নেই। মানুষের ভাষা আছে। এই ভাষার পরিচয়ই মানুষের মূল পরিচয়। তার জাতীয় পরিচয়। যেমন ইংরেজি ভাষী জাতিকে বলা হয় ইংরেজ, আরবি ভাষী জাতিকে আরব, তেমনি আমাদের ভাষা বাংলা বলে আমরা বাঙালি।

পণ্ডিতদের মতে, আজ থেকে প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে ভাষার জন্ম হয়েছিল। পৃথিবীতে নানা জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষার মধ্যে এখন প্রায় ৫০০০ মাতৃভাষা কার্যকর আছে। এর মধ্যে একমাত্র বাংলা ভাষার অধিকারের প্রশ্নেই একটি বড় আন্দোলন হয়েছে। আন্দোলনে প্রাণ দিয়েছেন ছাত্র-তরুণেরা। এমন বীরত্বব্যঞ্জক সংগ্রাম পৃথিবীতে খুব কমই হয়েছে। ভাষার সংগ্রামই এ দেশের মানুষকে স্বাধীনতার সংগ্রাম শিখিয়েছে, শিখিয়েছে আত্মত্যাগ। বাংলা ভাষার এই বিশাল মহান ও গৌরবজনক সংগ্রাম বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় এখন এক সমুজ্জ্বল সংযোজন।

কিন্তু আমাদের সেই মাতৃভাষা বাংলা চর্চার ক্ষেত্রে আমরা কতটা আন্তরিক ও সচেতন? আমাদের আজ এ বিষয়টিও তলিয়ে দেখা প্রয়োজন। বিশ্ব যেখানে আমাদের শহীদ দিবস একুশে

শহীদ মিনারে শিশুদের শ্রদ্ধা নিবেদন

www.phulkuri.org.bd

ফেব্রুয়ারিকে বরণ করে নিয়েছে, সেখানে আমরা আমাদের মাতৃভাষা চর্চায় আর হেলাফেলার পরিচয় দিতে পারি না, ছলনার আশ্রয়ও নিতে পারি না।

আমরা যখন বাংলা ভাষা পড়ি বা লিখি তখন আমাদের উচিত শুদ্ধ ভাবে পড়া ও লেখা। আমরা একটু সচেতন হলেই আমাদের উচ্চারণের ত্রুটি শুধরে নিতে পারি। বাংলা একাডেমী এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বানান রীতি অনুসরণ করলে আমাদের বানান ভুলও কমে আসতে পারে। পাশাপাশি আমাদের অভিধান দেখার অভ্যাসও গড়ে তুলতে হবে। এর জন্য তেমন বিশেষ কিছুর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন শুধু আন্তরিকতা ও ভালোবাসা।

আমাদের ভাষা আন্দোলন কিন্তু অন্য কোনো ভাষার বিরুদ্ধে ছিল না। ভাষা আন্দোলনের মূল সুরটা ছিল আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে যথাযথ মর্যাদায় অভিষিক্ত করা। আমরা অবশ্যই আন্তরিকভাবে তা করতে চেষ্টা করব। তাই বলে এই নয় যে, আমরা বাংলা ছাড়া অন্য ভাষা শিখব না বা লিখব না। আমরা প্রয়োজনে ইংরেজি বা অন্যান্য বিদেশী ভাষা শিখব ও ব্যবহার করব। তবে তা বাংলাকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করে করব না। আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে আমাদের মাতৃভাষা বাংলা কোনো দরিদ্র ভাষা নয়। বাংলা পৃথিবীর অন্যতম বয়স্ক, সমৃদ্ধ ও উন্নত ভাষা। এ ভাষার রূপ শোভা ও সৌন্দর্য বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করেছে। এ ভাষার কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পেয়েছেন সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার। এ ভাষার আন্দোলন আজ বিশ্বসভার স্বীকৃতি পেয়েছে।

এমন বিশ্বনন্দিত একটি ভাষা আমাদের মাতৃভাষা। এ নিশ্চয়ই আমাদের জন্য এক পরম গর্ব ও অহঙ্কারের বিষয়।

www.phulkuri.org.bd

তথ্যসূত্রের জন্য ঋণ স্বীকার

১. শিশু-বিশ্বকোষ (১ম-৫ম খণ্ড) — বাংলাদেশ শিশু একাডেমী।

২. শহীদ মিনার — রফিকুল ইসলাম, (১৯৮৫) বাংলা একাডেমী।

৩. অমর একুশে — হায়াৎ মামুদ (১৯৮৫), বাংলা একাডেমী।

৪. একুশের স্মারকগ্রন্থ '৯১ — বাংলা একাডেমী।

৫. একুশের স্মারকগ্রন্থ '৯৩ — বাংলা একাডেমী।

৬. একুশের স্মারকগ্রন্থ '৯৪ — বাংলা একাডেমী।

৭. একুশের প্রবন্ধ '৯৪ — বাংলা একাডেমী।

৮. আমাদের ভাষার লড়াই — বদরুদ্দীন উমর (১৯৯৯), জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন।

৯. বাংলা ও বাঙালির কথা — আবুল মোমেন (১৯৯২) জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী।

১০. ছোটদের বিশ্বকোষ ১ম খণ্ড (১৯৯০) — মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

১১. লালনীল দীপাবলী — হুমায়ুন আজাদ (১৯৭৬), বাংলা একাডেমী।

১২. কতোনদী সরোবর — হুমায়ুন আজাদ, (১৯৮৭), অনিন্দ্য প্রকাশন।

১৩. বুক পকেটে জোনাকিপোকা — হুমায়ুন আজাদ, (১৯৯৩), আগামী প্রকাশনী।

১৪. বাঙলা ভাষার শত্রুমিত্র — হুমায়ূন আজাদ, (১৯৮৩), বাংলাদেশ ভাষাবিজ্ঞান পরিষদ।

১৫. বাংলার প্রাচীন সভ্যতা ও পুরাকীর্তি — খন্দকার মাহ্‌মুদুল হাসান, (২০০০), শিখা প্রকাশনী।

১৬. হাজার বছরের স্বপ্ন বাংলা একাডেমী — মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ, (১৯৯৪) বাংলা একাডেমী।

১৭. ভাষা আন্দোলনের গল্প — আসজাদুল কিবরিয়া (১৯৯৬), প্রজাপতি প্রকাশন।

১৮. অমর একুশে ফেব্রুয়ারি — ফারুক নওয়াজ, (২০০০), জোনাকী প্রকাশনী।

১৯. স্লোগান — ফেব্রয়ারি ২০০২, দৈনিক আজাদী।

২০. টইটম্বুর — ফেব্রুয়ারি ২০০৩, শিশু কিশোর মাসিক পত্রিকা।

২১. একুশের ছড়া-কবিতা — ফারুক হোসেন সম্পাদিত, আগামী প্রকাশনী।

২২. অন্যদিন॥ ৭ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, ১—১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০২।

২৩. শিশু — ফেব্রুয়ারি ২০০৩ বাংলাদেশ শিশু একাডেমী।

২৪. গল্প যখন ভাষা নিয়ে — আতোয়ার রহমান, (১৯৭৯) মুক্তধারা।

www.phulkuri.org.bd

আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা বাংলার বয়স এক হাজারেরও বেশি। পৃথিবীর নানা ভাষাগোষ্ঠীর প্রায় পাঁচ হাজার মাতৃভাষার মধ্যে একমাত্র বাংলা ভাষার অধিকারের প্রশ্নেই একটি বড় আন্দোলন হয়েছে। এ ভাষার রূপ, শোভা ও সৌন্দর্য বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করেছে। এ ভাষার আন্দোলন আজ পেয়েছে বিশ্বসভার স্বীকৃতি। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির শোকগাথা পরিণত হয়েছে আমাদের বীরগাথায়। এই বই সেই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামেরই পরিচয়। এই বইয়ে আছে বাংলা ভাষা, ভাষা আন্দোলন, ভাষা আন্দোলনের শহীদ, শহীদ মিনার, বাংলা একাডেমী, একুশে গ্রন্থমেলা, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, আমাদের জাতীয় জীবনে ও কর্মে একুশের প্রভাব ইত্যাদি সম্পর্কে প্রাণবন্ত কথামালা। অত্যন্ত আবেগময় স্নিগ্ধ অনুপম ভাষায় কিশোর-তরুণদের জন্য বইটি লিখেছেন নিষ্ঠাবান সাহিত্যিক সুজন বড়ুয়া। এই বই মাতৃভাষা ও মাতৃভূমিকে ভালোবাসতে নতুন প্রজন্মকে যেমন উদ্বুদ্ধ করবে, তেমনি তাদের জ্ঞানের দিগন্তকে করবে প্রসারিত।

ISBN 984-642-073-0
9 789846 420739

www.phulkuri.org.bd